শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মচরিত

সংকলক নীরেন্দ্র গুপ্ত

বাণীশিল্প কলিকাতা

Sri Ramkrishner Atmacharit
Compiled by
Nirendra Gupta

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬৮

প্রকাশক
অরবিন্দ জানা
বাণীশিল্প
১১৩ই, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রাকর
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

কথামৃত-কার শ্রীম

এবং লীলাপ্রসঙ্গ-প্রণেতা স্বামী সারদানন্দের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

নিবেদন

জীবনী এবং আত্মজীবনী পরস্পরের পরিপূরক হলেও মর্মসাধকদের ক্ষেত্রে আত্মজীবনীর মূল্য অনেক বেশী। যেহেতু এই সাধকেরা মনোজগতেই প্রধানতঃ বাস করেন এবং যেহেতু মনের গভীরতম অনুভব-অনুভূতি মূলতঃ জীবনীকারের নাগালের বাইরে থেকে যায় তাই এক্ষেত্রে আত্মজীবনীর অভাব অন্য কোনো-ভাবেই পূর্ণ হতে পারে না। একথা প্রমাণিত হয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 'আশাবতীর উপাখ্যান', কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', অন্নদাঠাকুরের 'স্বপ্নজীবন', যোগানন্দ পরমহংসের 'যোগীর আত্মকথা' প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের অনন্যতা থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বহুসাধনার ধারা এসে একসাথে মিলিত হয়েছিল। বহুমত এবং বহুপথ অবলম্বনে তিনি বিচিত্র সাধনা করেছিলেন এবং বহুমুখী অভিজ্ঞতা ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির আলোকে তাঁর অন্তশ্চেতনা নানা রঙে নানা স্বরে আলোকিত—আলোড়িত হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে মাতৃদর্শনের সময় থেকে শুরু করে ভক্তসমাগমের পূর্বপর্যন্ত সুদীর্ঘ সাধনকালে তাঁর মনোজগতের আবর্তন-বিবর্তন ও দিব্য-রূপান্তরের ইতিহাস অপরের পক্ষে একান্ত দুর্জ্ঞেয় এবং সুদক্ষতম জীবনীকারেরও আয়ত্তের বাইরে। আত্মজীবনীর অভাবে এই সুগভীর সংগোপন সংবেদন সাধারণের সম্পূর্ণ অগোচরেই থেকে যেতো চিরকাল।

কিন্তু মহামানবেরা অনেক সময় আগামীকালের জন্য আমাদের আশার অতিরিক্ত বস্তু রেখে যান। যা তাঁরা রেখে যান তারও যথার্থ তাৎপর্য আমরা সহসা উপলব্ধি করতে পারিনে। আর সেজন্যেই তাঁদের দানের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সুযোগ সর্বদা ঘটে ওঠে না।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' একাধিকবার পড়তে পড়তে হঠাৎ একসময় খেয়াল হল যে পরমহংসদেব আমাদের জন্য এমন একটি অমূল্য উপহার রেখে গেছেন, যার পূর্ণ রূপায়ণ এখনও সংলনের অপেক্ষায়। সে উপহার তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আত্মকথা। আর এই আত্মকথার মধ্যেই রয়েছে তাঁর আত্মচরিতের সমস্ত উপাদান। শুধু বসে বসে মুক্তাগুলিকে কুড়িয়ে নিয়ে সূত্রে গ্রথিত করলেই সৃষ্ট হতে পারে এক অপূর্ব মুক্তাহার।

এ কোনো নূতন আবিষ্কার নয়, আবার এক অর্থে নূতন আবিষ্কারও বটে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ ভক্তদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বহির্জীবন ও অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথা প্রকাশ করেছেন তার গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় মূল্যই অপরিসীম। নিজের জীবন-সাধনার রহস্য ও নিভৃততম গভীরতম অনুভবের কথা এমন করে আর কোনো সাধক বলতে চেয়েছেন কিনা এবং বলতে পেরেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। কথামৃতের পাঁচ খণ্ড এবং লীলাপ্রসঙ্গের পাঁচ খণ্ড— এই দশটি খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের যে-সব উক্তি উদ্ধৃত আছে তার প্রামাণ্যতা সর্বজনস্বীকৃত। তার ভেতর থেকে আত্মকথার অংশগুলোকে চয়ন করে নিয়ে, বাইরে থেকে একটি কথাও যুক্ত না করে, শুধুমাত্র যথাযথ সামঞ্জস্য রেখে সময়ানুগভাবে তাদের সাজিয়ে তুলতে পারলেই একটি ধারাবদ্ধ আত্মচরিতের রূপ সুস্পষ্ট হয়ে জেগে ওঠে। বর্তমান আত্মচরিত সেভাবেই সঙ্কলিত বলে এর প্রামাণিকতাও পূর্বাবধি সিদ্ধ।

এই সঙ্কলনের কাজে মৌলিক চিন্তার অবকাশ না থাকলেও যথেষ্ট পরিশ্রম ও অনলস বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হয়েছে। কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গের সর্বসমেত দশটি খণ্ডের মধ্যে বারবার আসা-যাওয়া করা এবং বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে আত্মকথামূলক অংশগুলিকে বেছে নেওয়া প্রধানতঃ পরিশ্রমসাপেক্ষ। কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে কোনোরকম বিকৃত না করে সামঞ্জস্য ও প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে পরস্পর যুক্ত করার কাজ আমার পক্ষে খুব সহজ বলে প্রতিপন্ন হয়নি।

কিছু কিছু সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়েছে। রামকৃষ্ণদেবের উক্তিতে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে যে সময় ও বয়সের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাঁর প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থে লিপিবদ্ধ সময়ের সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার কিছু পার্থক্য রয়েছে। তবু এই আত্মচরিতে তাঁর স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত বক্তব্যই হুবহু ব্যবহার করেছি। সুদূর বাল্য ও কৈশোরকালের স্মৃতিবদ্ধ সময়চেতনা প্রামাণ্য ইতিহাসের মত পুঙ্খানুপুঙ্খ না হওয়াই স্বাভাবিক।

আবার একই ঘটনার কথা তিনি কোথাও কোথাও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন—এমনও দেখা যায়। সেক্ষেত্রে একই বিষয় সম্পর্কে একাধিক উক্তিকে মনোযোগের সঙ্গে বিচার করে সাবধানে সমন্বিত করা হয়েছে, যাতে করে কোনো কথার অকারণ পুনরাবৃত্তি না ঘটে, অথচ কোনো কথা বাদও না পড়ে যায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সমন্বয়ের সুবিধার জন্য বাইরের কোনো শব্দ তার সঙ্গে সংযোজিত হয় নি।

আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ প্রয়োজন। কথামৃত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের মৌখিক ভাষার রূপটি যথাসম্ভব অবিকৃতভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। সারদাদেবী কথামৃতকারকে আশীর্বাদ জানিয়ে বলেছিলেন—"তোমার নিকট যে-সমস্ত তাঁহাব কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই এ সমস্ত কথা বলিতেছেন।" এই মূল্যবান সাক্ষ্য থেকেই কথামৃতের ভাষার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যেতে পারে। কিন্তু লীলাপ্রসঙ্গের কোনো কোনো খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে রেখেও তা সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এমন কি একই উক্তি কথামৃতে চলিত ভাষায় কিন্তু লীলাপ্রসঙ্গে সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে এমনও দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে কথামৃতের ভাষাকেই আদর্শরূপে সামনে রেখে লীলাপ্রসঙ্গের সাধু ভাষায় নিবদ্ধ উক্তিগুলিকে চলিত ভাষায় রূপান্তরিত করে নিয়েছি।

এভাবে বিভিন্ন অসুবিধার সমাধান করতে গিয়ে আলোচ্য সংকলনে কিছু কিছু ত্রুটী ঘটে যাওয়া খুবই সম্ভব। তবু বলব, আত্মচরিতের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা তার দ্বারা মূলতঃ ক্ষুণ্ণ হতে পারে না।

গ্রন্থশেষের পরিশিষ্ট-অংশে আত্মচরিতে সঙ্কলিত প্রতিটি উক্তির সংগ্রহসূত্র প্রথম থেকে ক্রমানুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে প্রায় একই ধরনের উক্তিগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সমন্বিত করা হয়েছে সেখানে সংগ্রহসূত্রগুলি একসাথে পর পর উল্লিখিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক

আত্মচরিতে ব্যবহৃত যে-কোনো অংশের সঙ্গে সংগ্রহসূত্র অনুসারী পাঠ মিলিয়ে দেখতে পারেন। বস্তুতঃ আত্মচরিত-সঙ্কলনের প্রতিটি বাক্যই যে প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত, সংগ্রহসূত্র থেকে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে পাঠকেরা এ গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হবেন বলে আশা রাখি।

গ্রন্থের প্রারম্ভে সংকলক হিসাবে এই কটি কথাই নিবেদন করার ছিল। নইলে স্বয়ংপ্রকাশ এই আত্মচরিত অন্য কোনো ভূমিকার কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না।

নীরেন্দ্র গুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণের
আত্মচরিত

প্রথম পর্ব। ১৮৩৬-১৮৫৫

দক্ষিণেশ্বর ও মাতৃদর্শন

১ ॥ আমার বাবা যখন খড়ম পরে রাস্তায় চলতেন, গাঁয়ের দোকানীরা দাঁড়িয়ে উঠত। বলত, ঐ তিনি আসছেন। যখন হালদার পুকুরে স্নান করতে যেতেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। খপর নিত, উনি কি স্নান করে গেছেন? 'রঘুবীর রঘুবীর' বলতেন আর তাঁর বুক রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

বাবা কখনো শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই। পূজা জপ ধ্যানে দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। রোজ সন্ধ্যা করবার কালে 'আয়াহি বরদে দেবি' এইসব গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করতে করতে বুক রক্তবর্ণ হত, দুচোখ জলে ভেসে যেত। আবার যখন পূজাদি না করতেন তখন তিনি রঘুবীরকে সাজাবার জন্যে স্চ স্তো ও ফুল নিয়ে মালা গেঁথে সময় কাটাতেন। মিথ্যাসাক্ষ্য দেবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটে ছেড়েছিলেন। গ্রামের লোক ঋষির মত তাঁকে মান্যভক্তি করত।

আমার মা ছিলেন একেবারেই সরল। সংসারের কোনো বিষয় বুঝতেন না; টাকা পয়সা গুণতে জানতেন না। কাকে কোন্ বিষয় বলতে নাই তা না জানাতে নিজের পেটের কথা সকলের কাছেই বলে ফেলতেন, তাই লোকে তাঁকে 'হাউড়ো' বলত। তিনি সবাইকে খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন।

বাবা গয়াতে গিছলেন। সেখানে রঘুবীর স্বপন দিলেন, আমি

তোদের ছেলে হব। বাবা স্বপন দেখে বললেন, ঠাকুর, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কেমন করে তোমার সেবা করব? রঘুবীর বললেন, তা হয়ে যাবে।

ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেবেলায় আমায় পুরুষমেয়ে সকলে ভালবাসত। আমার গান শুনত। আবার লোকদের নকল করতে পারতুম, সেইসব দেখত ও শুনত। তাদের বাড়ির বউরা আমার জন্যে খাবার জিনিষ রেখে দিত। কেউ অবিশ্বাস করত না। সকলে দেখত যেন বাড়ির ছেলে।

কিন্তু সুখের পায়রা ছিলুম। বেশ ভাল সংসার দেখলে আনাগোনা করতুম। যে-বাড়িতে দুঃখ-বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম। ছোকরাদের ভেতর দুএকজন ভাল লোক দেখলে খুব ভাব করতুম। কারুর সঙ্গে সেঙ্গাত্ পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা ঘোর বিষয়ী। এখন তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ওমা! পাঠশালে যেমন দেখেছি এখানেও ঠিক তাই দেখছি।

পাঠশালে শুভঙ্কর আঁক ধাঁধাঁ লাগত। কিন্তু চিত্র বেশ আঁকতে পারতুম, আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম। সদাব্রত অতিথিশালা যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম, গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতুম। কোনোখানে রামায়ণ বা ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম। তবে যদি ঢং করে পড়ত তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকদের শুনাতুম।

মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা সুর নকল করতুম। কড়ে রাড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে, যা-ই। বারান্দায় মাগীরা ডাকছে, ও তপ্সে মাছওলা! নষ্ট মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সোজা সিঁথে কেটেছে আর খুব অনুরাগের সহিত গায় তেল মাখছে। লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা।

"ধোরো না ধোরো না রথ

রথ কি চক্রে চলে........."

এসব গান আমি ছেলেবেলায় খুব গাইতুম। এক এক যাত্রার সমস্ত পালা গেয়ে দিতে পারতুম। কেউ কেউ বলত, আমি 'কালীয়-দমন' যাত্রার দলে ছিলুম।

লাহাদের ওখানে সাধুরা যা পড়ত, বুঝতে পারতুম। (এখন) কোনো পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বুঝতে পারি। কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।

আমার দশ এগার বছর বয়সে যখন ওদেশে ছিলুম, সেই সময় ঐ অবস্থাটি (সমাধি অবস্থা) হয়েছিল। মাঠ দিয়ে যেতে যেতে যা দর্শন করলুম তাতে বিহ্বল হয়েছিলুম। ওদেশে ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নেই, তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জল-ভরা মেঘ উঠেছে, তাই দেখছি আর খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এমন এক বাহার হল। দেখতে দেখতে ভাবে ভোর হয়ে এমন একটা অবস্থা হল যে আর হুঁশ রইল না। পড়ে গেলুম, মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলুম, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।

বিশালাক্ষী দেখতে গিয়েও মাঠে ঐ অবস্থা হয়। কি দেখলুম, একেবারে বাহ্যশূন্য।

একজনদের বাড়ি প্রায় সর্বদাই গিয়ে থাকতুম। তারা সমবয়সী। তাদের মা সকলকে ঘৃণা করত। শেষে সেই মার পায়ের খিল কি রকম করে খুলে গেল আর পা পচতে লাগল। ঘরে এত পচা গন্ধ হল যে লোকে ঢুকতে পারত না।

ছেলেবেলায় ওদেশে ডেপুটি দেখেছিলুম। ঈশ্বর ঘোষাল, মাথায় তাজ—সব হাড়ে কাঁপে। ডেপুটি কি কম গা।

শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। তার সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাতদিন একসঙ্গে থাকতুম। তখন ষোলো সতর বছর বয়স। লোকে বলত, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হলে দুজনের বিয়ে হত। তাদের বাড়িতে দুজনে খেলা করতুম। তখনকার সব কথা মনে পড়ছে। তাদের কুটুম্বেরা পাল্‌কী চড়ে আসত। বেয়ারাগুলো 'হিঞোর হিঞোর' বলতে থাকত।

২ ॥ যখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স কালীঘরে বললে, তুই কি অক্ষর হতে চাস্? অক্ষর মানে জানি না। জিজ্ঞাসা করলুম, হলধারী বললে, ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাত্মা।

দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে একজন পাগল এসেছিল। পূর্ণজ্ঞানী, ছেঁড়া জুতো, হাতে কঞ্চি, এক হাতে একটি ভাঁড় আবচারা। গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে কোনো সন্ধ্যা-আহ্নিক নাই, কোঁচড়ে কি ছিল তাই খেলে। তারপর কালীঘরে গিয়ে

স্তব করতে লাগল—ক্ষ্রোং ক্ষ্রোং খট্টাঙ্গধারিণীং ইত্যাদি। মন্দির কেঁপে গিয়েছিল। হলধারী তখন কালীঘরে ছিল। অতিথিশালায় এরা তাকে ভাত দেয় নাই—ভ্রূক্ষেপ নাই। পাত কুড়িয়ে খেতে লাগল—যেখানে কুকুরগুলো খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কুকুরগুলোকে কান ধরে সরিয়ে নিজে খেতে লাগল,—তা কুকুরগুলো কিছু বলে নাই। হলধারী পেছু পেছু গিয়েছিল আর জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কে? তুমি কি পূর্ণজ্ঞানী? তখন সে বলেছিল, আমি পূর্ণজ্ঞানী! চুপ!

আমি হলধারীর কাছে যখন এসব কথা শুনলুম, আমার বুক গুরগুর করতে লাগল, আর হৃদেকে জড়িয়ে ধরলুম। মাকে বললুম, মা, তবে আমারও কি এই অবস্থা হবে! আমরা দেখতে গেলুম, আমাদের কাছে খুব জ্ঞানের কথা—অন্যলোক এলে পাগলামী। যখন চলে গেল, হলধারী অনেকখানি সঙ্গে গিয়েছিল। ফটক পার হলে হলধারীকে বলেছিল, তোকে আর কি বলব। এই ডোবার জল আর গঙ্গাজলে যখন কোনো ভেদবুদ্ধি থাকবে না, তখন জানবি পূর্ণজ্ঞান হয়েছে। তারপর বেশ হন্‌হন্ করে চলে গেল।

দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী দেখেছিলুম। ন'হাত লম্বা চুল। সন্ন্যাসীটি 'রাধে রাধে' করত। ঢং নাই।

কি অবস্থাই গিয়েছে। এখানে খেতুম না। বরাহনগরে, কি দক্ষিণেশ্বরে, কি এড়েদায়, কোনো বামুনের বাড়ি গিয়ে পড়তুম। আবার পড়তুম অবেলায়। গিয়ে বসতুম, মুখে কোনো কথা নাই। বাড়ির লোক কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে কেবল বলতুম, আমি এখানে খাব। আর কোনো কথা নাই। আলমবাজারে রাম চাটুয্যের বাড়ি যেতুম। আবার কখনো দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ীতে যেতুম। তাদের বাড়ি খেতুম বটে, কিন্তু ভাল লাগত না, কেমন আষ্টে (আঁশটে) গন্ধ।

তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধনের দরকার। আমাকে কঠোর সাধন করতে হয়েছে। বেলতলায় কতরকম সাধন করেছি। গাছ তলায় পড়ে থাকতুম, মা দেখা দাও বলে। চক্ষের জলে গা ভেসে যেত।

দেহের দিকে একেবারেই মন ছিল না। মাথার চুল লম্বা হয়ে ধূলোমাটি লেগে লেগে আপনি জটা পাকিয়ে গিয়েছিল। ধ্যানে বসলে শরীরটা কাঠের মত হয়ে যেত। পাখি এসে মাথার উপর বসে থাকত আর ঠোঁট চুলের মধ্যে ডুবিয়ে খাবার খোঁজ করত। আবার সময়ে সময়ে তাঁর বিরহে অস্থির হয়ে মাটিতে এমন করে মুখ ঘষতুম যে কেটে গিয়ে জায়গায় জায়গায় রক্ত বের হত। ঐভাবে কখনো ধ্যান-ভজনে, কখনো প্রার্থনায় সারাদিন যে কোথা দিয়ে কেটে যেত, হুঁশই থাকত না। পরে সন্ধ্যা হলে যখন চারদিকে শাঁখের আওয়াজ হতে থাকত, তখন মনে পড়ত—দিন শেষ হল, আর একটা দিন বৃথা কেটে গেল, মার দেখা পেলুম না। তখন দারুণ অনুতাপে মন এমন ব্যাকুল করে তুলত যে আর স্থির থাকতে পারতুম না। মাটিতে আছড়ে পড়ে 'মা এখনও দেখা দিলি না' বলে চিৎকার করে কাঁদতুম আর যন্ত্রণায় ছটফট করতুম। লোকে বলত, পেটে শূলব্যথা ধরেছে, তাই অত কাঁদছে।

সকলেরই যে বেশি তপস্যা করতে হয় তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতুম। কোথা দিয়ে দিন চলে যেত। কেবল 'মা মা' বলে ডাকতুম, কাঁদতুম।

মার দেখা পেলুম না বলে তখন প্রাণে অসহ্য যাতনা। ভেজা গামছা লোকে যেমন করে নিঙড়ায়, মনে হল আমার মনটাকে ধরে কে যেন তেমনি করছে। মার দেখা বুঝি আর কোনো কালে পাব না, ভেবে যাতনায় ছটফট করতে লাগলুম। অস্থির হয়ে ভাবলুম, তবে আর এ জীবনে কাজ কি। মার ঘরে যে খাঁড়া ছিল, হঠাৎ তার উপর চোখ পড়ল। এই দণ্ডেই জীবন শেষ করব ভেবে

পাগলের মত ছুটে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ মার অদ্ভুত দর্শন পেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর বাইরে যে কি হয়েছে, কোথা দিয়ে যে সেদিন তার পরদিন গিয়েছে, কিছুই জানতে পারি নাই।

অন্তরে কি এক জমাট-বাঁধা আনন্দের জোয়ার বইছিল, আর মার সাক্ষাৎ প্রকাশ অনুভব করলুম। ঘর দরজা মন্দির সব যেন কোথায় মিলিয়ে গেল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই। আর দেখছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতির সমুদ্র। যেদিকে যতদূরে দেখি, চার দিক থেকে তার আলোর ঢেউ যেন শব্দ করে ছুটে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে ঢেউগুলো আমার উপর এসে পড়ল আর এককালে আমায় কোথায় তলিয়ে দিল। হাঁপিয়ে হাবুডুবু খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম।

সেইদিন থেকে আর একরকম হয়ে গেলুম। নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগলুম। যখন ঠাকুরপূজো করতে যেতুম, হাতটা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে না গিয়ে নিজের মাথার উপর আসত, আর ফুল মাথায় দিতুম। যে ছোকরা আমার কাছে থাকত, সে আমার কাছে আসত না। বলত, তোমার মধ্যে কি এক জ্যোতি দেখছি, তোমার বেশি কাছে যেতে ভয় হয়।

৩॥ দক্ষিণেশ্বরে আমার যখন প্রথম এরূপ অবস্থা হল, কিছুদিন পরে একটি ভদ্রঘরের বামুনের মেয়ে এসেছিল। বড় সুলক্ষণা। যাই গলায় মালা আর ধূপ ধূনা দেওয়া হল অমনি সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে আনন্দ, আর ধারা পড়তে লাগল। আমি তখন প্রণাম করে বললুম, মা আমার হবে? তা বললে, হ্যাঁ।

কি অবস্থাই গেছে। মুখ করতুম আকাশ পাতাল জোড়া, আর 'মা' বলতুম। যেন মাকে পাকড়ে আনছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়হড় করে টেনে আনা। আমি মা বলে এইরূপে ডাকতুম—মা আনন্দময়ী, দেখা দিতে হবে যে। আবার কখনো বলতুম—ওহে দীননাথ, জগন্নাথ, আমি তো জগৎছাড়া নই নাথ। আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন—আমি কিছুই জানি না—দয়া করে দেখা দিতে হবে।

আমি ব্যাকুল হয়ে একলা একলা কাঁদতুম। কোথায় নারায়ণ—এই বলে কাঁদতুম। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেতুম—মহাবায়ুতে লীন।

'মা মা' বলে এমন কাঁদতুম লোক দাঁড়িয়ে যেত। চারদিকে লোক দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের ছায়া বা পটে আঁকা মূর্তি বলে মনে হত। তাই মনে কোনো লজ্জা সঙ্কোচ হত না। অসহ্য যাতনায় সময় সময় বেহুঁশ হয়ে পড়তুম আর ওরূপ হবার পরই দেখতুম মার

বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি। দেখতুম ঐ মূর্তি হাসছে, কথা কইছে, কত কি বোঝাচ্ছে, শেখাচ্ছে।

মার নাটমন্দিরের ছাদের আল্‌সেতে যে ধ্যানী ভৈরব-মূর্তি আছে, ধ্যান করতে যাবার আগে তাঁকে দেখিয়ে মনকে বলতুম, এমনি স্থির হয়ে মার পাদপদ্ম চিন্তা করতে হবে। ধ্যানে বসেছি কি শুনতে পেতুম, দেহের সন্ধিগুলো সব পায়ের দিক থেকে উপরদিকে একে একে খট্‌খট্‌ করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—কে যেন ভিতর থেকে সব তালা লাগিয়ে দিচ্ছে। যতক্ষণ ধ্যান করতুম ততক্ষণ দেহটা যে একটু নেড়েচেড়ে অন্যভাবে বসব, বা ধ্যান ছেড়ে গিয়ে অন্য কিছু করব, তার জো ছিল না। আগের মত আবার খট্‌খট্‌ করে উপর থেকে পা অবধি সন্ধিগুলো যতক্ষণ না খুলে যেত ততক্ষণ কে যেন জোর করে বসিয়ে রাখত। ধ্যানে বসে প্রথম প্রথম জোনাকীর মত অসংখ্য আলোর বিন্দু দেখতে পেতুম, কখনো বা কুয়াশার মত আলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে দেখতুম, আবার কখনো বা গলানো রূপোর মত আলোর ঢেউ এসে সব কিছু ঢেকে ফেলত। চোখ বুজে ঐরকম দেখতুম, আবার অনেক সময় চোখ চেয়েও দেখতে পেতুম। কি দেখছি বুঝতে পারতুম না। ঐ রকম দেখা ভাল কি মন্দ তাও জানতুম না। তাই আকুল হয়ে মার কাছে প্রার্থনা জানাতুম, মা আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝি না, তোকে ডাকবার মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানি না। যেমন করলে তোকে পাওয়া যায়, তুই-ই তা আমায় শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে কে আর শেখাবে মা। তুই ছাড়া আমার আর গতি নাই। একমনে এইভাবে প্রার্থনা করতুম আর ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদতুম।

আমি কাঁদতুম আর ব্যাকুলপ্রাণে বলতুম, মা, এ বলছে এই এই, ও বলছে আর এক রকম। কোন্‌টা সত্য তুই আমায় বলে দে। তিনদিন ধরে কেঁদেছি, আর বেদ-পুরাণ-তন্ত্র এসব শাস্ত্রে কি আছে—সব দেখিয়ে দিয়েছেন। মাকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলুম, মা, বেদ-বেদান্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও—পুরাণ-তন্ত্রে কি

আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়। প্রতিমা চিন্ময়—বেদী চিন্ময়—কোশা-কুশি চিন্ময়—চৌকাট চিন্ময়—মার্বেলের পাথর—সব চিন্ময়। ঘরের ভিতর দেখি সব যেন রসে রয়েছে। সচ্চিদানন্দ রসে। কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলুম, কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বলজ্বল করছে দেখলুম।

তাই তো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলুম। দেখলুম মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত। তখন খাজাঞ্চি সেজবাবুকে চিঠি লিখলে যে ভটচার্জিমশায় ভোগের লুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। সেজবাবু আমার অবস্থা বুঝত। পত্রের উত্তরে লিখলে, উনি যা করেন তাতে কোনো কথা বোলো না।

৪॥ সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আরো কত কি দেখতুম। বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপ-পুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণ-সুখ, নানারকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাকতে

লাগলুম। বড় গুহ্য কথা। মা দেখা দিলেন। তখন আমি বললুম, মা, ওকে কেটে ফেল। মার সেই রূপ—সেই ভুবনমোহন রূপ—মনে পড়ছে, কৃষ্ণময়ীর (বলরামের বালিকা কন্যার) রূপ। কিন্তু চাউনিতে যেন জগৎটা নড়ছে। আরও কত কি—বলতে দেয় না। মুখ যেন কে আটকে দেয়।

সন্ধ্যাপূজা করতে করতে ভিতরের পাপ-পুরুষ যেন দগ্ধ হয়ে গেল—এরূপ চিন্তা যখন করতুম, তখন কে জানত, শরীরে সত্যি পাপ-পুরুষ আছে আর বাস্তবিক তাকে দগ্ধ করে নাশ করা যায়। সাধনা সুরু করার পর থেকেই গায়ে দারুণ জ্বালা। ভাবলুম এ আবার কি রোগ হল। ক্রমে তা বেড়ে অসহ্য হয়ে উঠল। নানা কবরেজী তেল মাখা হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসে আছি, হঠাৎ দেখছি কি, মিশ্‌কালো রং, টকটকে লাল চোখ, ভয়ানক আকার একটা পুরুষ যেন মদ খেয়ে টলতে টলতে এর (নিজ শরীরের) ভিতর থেকে বের হয়ে এল আর সামনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপরই দেখি কি—আর একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ গেরুয়া আর ত্রিশূল ধারণ করে ঐরূপে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আর আগেকার পুরুষটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেললে। সেদিন থেকেই গায়ের জ্বালার উপশম হল। তার আগে ছ'মাস যাবৎ কষ্ট পেয়েছিলুম।

যখন এই অবস্থা প্রথম হল, তখন মা কালীকে পূজা করতে বা ভোগ দিতে আর পারলুম না। হলধারী আর হৃদে বললে, খাজাঞ্চি বলেছে, ভটচায্যি ভোগ দেবে না তো কি···করবেন? আমি কুবাক্য বলেছে শুনে খুব হাসতে লাগলুম। একটুও রাগ হল না।

এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুলতা হত। কোথায় ভাগবত, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত খুঁজে বেড়াতুম। এঁড়েদার কৃষ্ণকিশোরের কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতুম। বিষয়ীলোক আসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতুম।

আমি মার কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলুম। ফুল হাতে করে মার পাদপদ্মে দিয়েছিলুম, বলেছিলুম, মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।

দেখ, জ্ঞান পর্যন্ত আমি চাই নাই। আমি লোকমান্যও চাই নাই। ধর্মাধর্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি—অমলা নিষ্কাম অহৈতুকী ভক্তি বাকী থাকে। যখন এই সব বলেছিলুম তখন একথা বলতে পারি নাই, মা, এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য। সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।

পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে 'টাকা মাটি, মাটিই টাকা, টাকাই মাটি'—এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হল। ভাবলুম, আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন, তাহলে কি হবে। তখন হাজরার মত পাটোয়ারী করলুম। বললুম, মা, তুমি যেন হৃদয়ে থেকো।

একদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহ্যে যাচ্ছিলুম, শুনতে পেলুম যে একটা কোলা ব্যাঙ্ খুব ডাকছে। বোধহল সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যখন ফিরে আসছি, তখনও দেখি ব্যাঙ্টা খুব ডাকছে। একবার উঁকি মেরে দেখলুম কি হয়েছে। দেখি একটা ঢোঁড়ায় ব্যাঙ্টাকে ধরেছে। ছাড়তেও পারছে না, গিলতেও পারছে না—ব্যাঙ্টারও যন্ত্রণা ঘুচছে না। তখন ভাবলুম, ওরে, যদি

জাতসাপে ধরত, তিন ডাকের পর ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেত। এ একটা ঢোঁড়ায় ধরেছে কিনা, তাই সাপটারও যন্ত্রণা, ব্যাঙ্‌টারও যন্ত্রণা।

কালীঘাটের চন্দ্র হালদার সেজবাবুর কাছে প্রায় আসত। আমি ঈশ্বরের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছি। চন্দ্র হালদার ভাবত আমি ঢং করে ঐরকম হয়ে থাকি, বাবুর প্রিয়পাত্র হব বলে। সে অন্ধকারে এসে বুটজুতার গোঁজা দিতে লাগল। গায়ে দাগ হয়েছিল। সবাই বললে, সেজবাবুকে বলে দেওয়া যাক। আমি বারণ করলুম।

৫ ॥ কি অবস্থাই গেছে। প্রথম যখন এই অবস্থা হল দিনরাত কোথা দিয়ে যেত বলতে পারি না। সকলে বলে, পাগল হল। আমার সেই উন্মাদ অবস্থায় লোকজনকে ঠিকঠিক কথা, হক কথা বলে ফেলতুম। কারুকে মানতুম না। বড়লোক দেখলে ভয় হত না। যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র ঠাকুর এসেছিল। আমিও সেখানে ছিলুম। আমি তাকে বললুম, কর্তব্য কি? জিজ্ঞাসা করলুম, ঈশ্বরচিন্তা করাই আমাদের কর্তব্য কিনা। যতীন্দ্র বললে, আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন। তখন আমার বড় রাগ হল। বললুম, তুমি কি রকম লোক গা। যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই মনে করে রেখেছ। যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে ভক্তি—এসব কিছু মনে হয় না। আরও কত কি বলতে

যাচ্ছিলুম, হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে। যতীন্দ্র একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল।

আর একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলুম জয় মুখুয্যে জপ করছে, কিন্তু অন্যমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে দুই চাপড় দিলুম।

একদিন রাসমণি ঠাকুর বাড়িতে এসেছে। কালীঘরে এলো। পূজার সময় আসত আর আমাকে দু'একটা গান গাইতে বলত। আমি গাচ্ছি, এমন সময় দেখি যে সে অন্যমনস্ক হয়ে ফুল বাছছে। অমনি দুই চাপড়। তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাত জোড় করে রইল।

তখন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজবাবু আর সেজগিন্নী যে ঘরে শুতো সে ঘরে আমিও শুতুম। তারা ঠিক ছেলেটির মত আমায় যত্ন করত। সেজবাবু বলত, বাবা, তুমি আমাদের কোনো কথাবার্তা শুনতে পাও? আমি বলতুম, পাই। সেজগিন্নী সেজবাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল, যদি কোথাও যাও, ভটচায্যিমশায় তোমার সঙ্গে যাবেন। এক জায়গায় গেল, আমায় নীচে বসালে। তারপর আধঘণ্টা পরে এসে বললে, চল বাবা, গাড়িতে উঠবে চল। সেজগিন্নী জিজ্ঞাসা করলে আমি ঠিক ঐসব কথাই বললুম। আমি বললুম, ছাখ গা, একটা বাড়িতে আমরা গেলুম। উনি আমায় নীচে বসালে, উপরে আপনি গেল। আধঘণ্টা পরে এসে বললে, চল বাবা, চল। সেজগিন্নী যা হয় বুঝে নিলে।

মাড়েদের এক সরিক এখানকার গাছের ফল কপি গাড়ি করে বাড়িতে চালান করে দিত। অন্য সরিকরা জিজ্ঞাসা করাতে আমি ঠিক তাই বললুম।

তিনি আমায় নানাভাবে সাধন করিয়েছেন। যখন 'রাম রাম'

করতুম তখন হনুমানের ভাবে হয়তো একটা ল্যাজ পরে বসে আছি। উন্মাদের অবস্থা। সে সময় খাওয়া-দাওয়া সব কাজ হনুমানের মত করতে হত। ইচ্ছা করে যে করতুম তা নয়, আপনি হয়ে যেত। পরনের ধুতিটি ল্যাজের মত করে কোমরে জড়িয়ে বাঁধতুম, লাফ মেরে চলতুম, ফলমূল ছাড়া আর কিছুই খেতুম না—তাও আবার খোসা ফেলতে ইচ্ছা হত না। গাছের উপরই অনেক সময় কাটিয়ে দিতুম আর সবসময়ই 'রঘুবীর রঘুবীর' বলে চিৎকার করতুম। চোখদুটো তখন চঞ্চলভাব ধরেছিল আর আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের নীচের দিকটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বেড়ে গিয়েছিল।

আমি সীতামূর্তি দর্শন করেছিলুম। দেখলুম সব মনটা রামেতেই রয়েছে। হাত পা বসনভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নেই। যেন জীবনটা রামময়। রাম না থাকলে, রামকে না পেলে প্রাণে বাঁচবে না।

পঞ্চবটীতলায় একদিন বসে আছি—ধ্যানচিন্তা কিছু যে করছিলুম তা নয়, অমনি বসেছিলুম, এমনি সময় এক জ্যোতির্ময় নারীমূর্তি সামনে এসে দেখা দিল। সমস্ত জায়গাটা আলোময় হয়ে গেল। ঐ মূর্তিই যে শুধু দেখতে পাচ্ছিলুম তা নয়, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সবকিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম। দেখলুম মানুষের চেহারা, দেবীর মত ত্রিনয়না নয়। কিন্তু প্রেম, দুঃখ, করুণা, সহিষ্ণুতা —সবকিছু মেশানো অমন মুখের ভাব দেবীমূর্তিতেও বড় একটা দেখা যায় না। ঐ মূর্তি ধীর পায়ে উত্তর থেকে দক্ষিণ মুখে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। অবাক হয়ে ভাবছি—কে ইনি? এমনি সময়ে একটি হনুমান কোথা থেকে হঠাৎ উ-উপ্ শব্দ করে এসে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল আর আমার ভিতর থেকে মন বলে উঠল, সীতা, জনমদুখিনী সীতা, জনকনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা। তখন 'মা মা' বলে অধীর হয়ে পায়ে পড়তে যাচ্ছি, হঠাৎ বিদ্যুতের মত এসে এর (নিজ শরীরের) ভিতর ঢুকে গেল।

আনন্দে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম। ধ্যানচিন্তা কিছু না করে এমন দর্শন এর আগে আর হয় নাই।

সে সময় সব মিলত। সে সময় তাঁর নাম করে যা বিশ্বাস করতুম, তাই মিলে যেত। যা যা মনে করতুম তাই হত। পঞ্চবটীতে তুলসীকানন করেছিলুম, জপ ধ্যান করব বলে। বঁ্যাকারির বেড়া দেবার জন্য বড় ইচ্ছা হল। তারপরেই দেখি জোয়ারে কতকগুলো বঁ্যাকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি ঠিক পঞ্চবটীর সামনে এসে পড়েছে। ঠাকুরবাড়ির একজন ভারী ছিল। সে নাচতে নাচতে এসে খবর দিলে।

যখন এই অবস্থা হল, পূজা আর করতে পারলুম না। বললুম, মা, আমায় কে দেখবে মা? আমার এমন শক্তি নাই যে নিজের ভার নিজে লই। আর তোমার কথা শুনতে ইচ্ছা করে, ভক্তদের খাওয়াতে ইচ্ছা করে, কারুকে সামনে পড়লে কিছু দিতে ইচ্ছা করে। এসব মা কেমন করে হয়। মা, তুমি একজন বড়মানুষ পেছনে দাও। তাই তো সেজবাবু এত সেবা করলে।

আবার বলেছিলুম, মা, আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধ-ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হল।

৬॥ আমার উন্মাদ অবস্থা। নারায়ণ শাস্ত্রী এসে দেখলে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি। তখন সে লোকদের কাছে বললে, ওহ্ উন্মত্ত হ্যায়।

সে অবস্থায় জাত-বিচার কিছু থাকত না। একজন নীচ জাতি, তার মাগ শাক রেঁধে পাঠাতো। আমি খেতুম। কালীবাড়িতে কাঙ্গালীরা খেয়ে গেল, তাদের পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধারী তখন আমায় বললে, তুই করছিস্ কি? কাঙ্গালীদের এঁটো খেলি, তোর ছেলেপিলের বিয়ে হবে কেমন করে? আমার তখন রাগ হল। হলধারী আমার দাদা হয়। তাহলে কি হয়? তাকে বললুম, তবে রে শ্যালা, তুমি না গীতা-বেদান্ত পড়? তুমি না শিখাও ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলেপিলে হবে তুমি ঠাউরেছ। তোর গীতাপাঠের মুখে আগুন।

সেজবাবুর সঙ্গে কদিন বজরা করে হাওয়া খেতে গেলুম। বজরাতে দেখলুম, মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, সেজবাবু বললে, বাবা ওখানে কি করছ? আমি হেসে বললুম, মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজবাবু বুঝেছে যে এবারে ইনি চেয়ে খেতে পারেন। তাই বললে, বাবা, সরে এসো, সরে এসো।

কিন্তু এখন আর পারি না। সে অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে, ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত খাব।

আমার এই অবস্থার পর আমাকে বীড়বার (পরীক্ষার) জন্য আর আমার পাগলামি সারাবার জন্য তারা একজন রাঁড় এনে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল—সুন্দর, চোখ ভাল। আমি 'মা মা' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম আর হলধারীকে আর সব লোকদের বলে দিলুম। এই অবস্থায় 'মা মা' বলে কাঁদতুম, কেঁদে কেঁদে বলতুম, মা রক্ষা কর, মা আমায় নিখাদ কর। যেন সৎ থেকে অসতে মন না যায়।

সকলে বলে, পাগল হল। তাই তো এরা বিবাহ দিলে। উন্মাদ অবস্থা—প্রথম চিন্তা হল, পরিবারও এইরূপ থাকবে, খাবে দাবে। শ্বশুরবাড়ি গেলুম। সেখানে খুব সংকীর্তন। নফর, দিগম্বর বাড়ুয্যের বাপ—এরা এলো। খুব সংকীর্তন। এক একবার ভাবতুম, কি হবে। আবার বলতুম, মা, দেশের জমিদার যদি আদর করে তাহলে বুঝব সত্য। তারাও সেধে এসে কথা কইত।

(কামারপুকুরে) একদিন একজন ওঝা এসে একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়িয়ে শুঁকতে দিল, বলল, যদি ভূত হয় তো পালিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হল না। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করে একদিন রাত্রিবেলা চণ্ড নামালো। চণ্ড পূজা ও বলি নিয়ে প্রসন্ন হয়ে তাদের বলল, একে ভূতে পায় নি বা এর কোনো ব্যাধি হয় নি। তারপর সবার সামনে আমায় ডেকে বলল, গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপুরী খাও কেন? বেশি সুপুরি খেলে কাম বৃদ্ধি হয়। এর আগে সত্যি আমি সুপুরি খেতে বড় ভালবাসতুম, যখন তখন খেতুম। চণ্ডের কথায় সে দিন থেকে ছেড়ে দিলুম।

কি অবস্থা সব গেছে। দেশে চিনে শাঁকারী আর আর সমবয়সীদের বললুম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার হরিবোল বল।

সকলের পায়ে পড়তে যাই। তখন চিনে বললে, ওরে তোর এখন প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধূলা ওড়ে, তখন আমগাছ তেঁতুলগাছ সব এক বোধ হয়। এটা আমগাছ, এটা তেঁতুলগাছ চেনা যায় না।

দেশে গেলুম। রামলালের বাপ ভয় পেলে। ভাবলে, যার তার বাড়িতে খাবে। ভয় পেলে, পাছে তাদের জাতে বার করে দেয়। আমি তাই বেশিদিন থাকতে পারলুম না, চলে এলুম (কলকাতায়)।

তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম। পূজা উঠে গেল। এই বেলগাছ। বেলপাতা তুলতে আসতুম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁস খানিকটা উঠে এল। দেখলুম গাছ চৈতন্যময়। মনে কষ্ট হল। দূর্বা তুলতে গিয়ে দেখি আর সেরকম করে তুলতে পারি না। তখন রোক করে তুলতে গেলুম। একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন বিরাট সম্মুখে, পূজা হয়ে গেছে, বিরাটের মাথায় ফুলের তোড়া। আর ফুল তোলা হল না।

ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হত। প্রত্যক্ষ দেখলুম, সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, এক থালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম আবার, মন, তুই কি চাস্? কিছু ভোগ করতে কি চাস্? মন বলল, না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না। মেয়েদের ভিতর-বার সমস্ত দেখতে পেলুম—যেমন কাচের ঘরে সমস্ত জিনিষ বার থেকে দেখা যায়। তাদের ভিতরে দেখলুম নাড়ী, ভুঁড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ, নাল, প্রস্রাব—এই সব।

হৃদে একদিন বলল, মামা, মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও। আমার বালকের স্বভাব, কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললুম, মা, হৃদে বলছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই

চাইতে। অমনি দেখিয়ে দিলে, সামনে এসে পিছন ফিরে উবু হয়ে বসল—একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স, ধামা পোঁদ, কালপেড়ে কাপড় পরা—পড়্ পড়্ করে হাগছে। মা দেখিয়ে দিলে যে সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা। তখন হৃদেকে গিয়ে বকলুম আর বললুম, তুই কেন আমায় এমন কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্যেই তো আমার এরূপ হল।

গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গাপ্রসাদ বলল, স্বর্ণপট্‌পটি খেতে হবে, কিন্তু জল খেতে পাবে না, বেদানার রস খেতে পার। সকলে মনে করলে, জল না খেয়ে আমি কেমন করে থাকব। আমি রোক করলুম, আর জল খাব না। পরমহংস, আমি তো পাতিহাঁস নই, রাজহাঁস—দুধ খাব।

একদিন অমনি গঙ্গাপ্রসাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলুম। তিনি চিকিৎসায় তেমন ফল হচ্ছে না দেখে চিন্তিত হলেন এবং বিশেষভাবে পরীক্ষা করে নতুন ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বাঙ্গালদেশের অন্য একজন বৈদ্যও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রোগের লক্ষণ শুনতে শুনতে তিনি বললেন, এর দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলে বোধহয়। এ হচ্ছে যোগজ ব্যাধি, ওষুধে সারবার নয়। উনিই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন, পাগলামি বলে যা মনে হয় তার আসল কারণ কি। কিন্তু কেউ-ই তখন তাঁর কথায় কান দেয় নি।

দিনরাত্রির প্রায় সময়ই মার কোনো না কোনো রকম দর্শন পেয়ে ভুলে থাকতুম তাই রক্ষা, নইলে এ খোলটা থাকা অসম্ভব হত। এখন থেকে সুরু করে ছ বছরকাল একতিল ঘুম হয়নি। চোখ পলকশূন্য হয়ে গিছল। সময় সময় চেষ্টা করেও পলক ফেলতে পারতুম না। সময়ের হুঁশ থাকত না। শরীর রক্ষার কথা প্রায় ভুলে গিছলুম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু মন আসত, তখন

তার অবস্থা দেখে ভারি ভয় হত। ভাবতুম, পাগল হতে বসেছি নাকি? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখতুম, পলক পড়ে কিনা। তাতেও চোখ সমান পলকশূন্য। ভয়ে কেঁদে ফেলতুম আর মাকে বলতুম, মা, তোকে ডাকার, তোর উপর বিশ্বাস করার কি এই ফল হল। শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি। একটু পরেই আবার বলতুম, তা যা হবার হক্ গে, শরীর যায় যাক্, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি। আমায় দেখা দে, কৃপা কর, আমি যে মা, তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি। তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি নাই। এমনি কাঁদতে কাঁদতে মন আবার উৎসাহে ভরে উঠত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলে মনে হত আর মার দর্শন ও অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হতুম।

॥ কি অবস্থাই গেছে। একটু সামান্যতেই একেবারে উদ্দীপন হয়ে যেত। সুন্দরী পূজা করলুম। চৌদ্দ বছরের মেয়ে। দেখলুম, সাক্ষাৎ মা। টাকা দিয়ে প্রণাম করলুম। রামলীলা দেখতে গেলুম। একেবারে দেখলুম সাক্ষাৎ সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, বিভীষণ। তখন যারা সেজেছিল তাদের সব পূজা করতে লাগলুম। কুমারীদের এনে তখন পূজা করতুম। দেখতুম সাক্ষাৎ মা।

একদিন বকুলতলায় দেখলুম, নীল বসন পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বেশ্যা। দপ্ করে একেবারে সীতার উদ্দীপন। ও

মেয়েকে ভুলে গেলুম, কিন্তু দেখলুম, সাক্ষাৎ সীতা—লঙ্কা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ বাহ্যশূন্য হয়ে সমাধি-অবস্থা হয়ে রইল। আর একদিন গড়ের মাঠে বেড়াতে গিছলুম। বেলুন উঠবে, অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটি সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা, অমনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন। সমাধি হয়ে গেল।

আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতুম। একদিন গিয়েছি, সে বলল, তুমি পান খাও কেন? আমি বললুম, খুশি পান খাব, আর্শিতে মুখ দেখব—হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব। কৃষ্ণকিশোরের পরিবার তাকে বকতে লাগল, বলল, তুমি কারে কি বলো? রামকৃষ্ণকে কি বলছ?

কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস। বৃন্দাবন গিছল। সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছে। কুয়ার কাছে গিয়ে দেখে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, আমি নীচ জাতি, আপনি ব্রাহ্মণ, কেমন করে আপনার জল তুলে দেব? কৃষ্ণকিশোর বলল, তুই বল্ 'শিব'। 'শিব শিব' বললেই তুই শুদ্ধ হয়ে যাবি। সে 'শিব শিব' বলে জল তুলে দিলে। অমনি আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে। কি বিশ্বাস!

এঁড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছিল। আমরা একদিন দেখতে যাব ভাবলুম। আমি কালীবাড়িতে হলধারীকে বললুম, কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে যাব। তুমি যাবে? হলধারী বলল, একটা মাটির খাঁচা দেখতে গিয়ে কি হবে? হলধারী গীতা বেদান্ত পড়ে কিনা, তাই সাধুকে বলল 'মাটির খাঁচা'। কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি ঐকথা বললুম। সে মহা রেগে গেল। আর বলল, কি! হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে আর সেইজন্য সর্বত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটির খাঁচা। সে জানে না যে ভক্তের দেহ চিন্ময়! এত রাগ—কালীবাড়িতে ফুল

তুলতে আসত, হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিত। কথা কইবে না।

আমায় বলেছিল, পৈতেটা ফেললে কেন? যখন আমার এই অবস্থা হল, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল। আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই। কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে? আমি কৃষ্ণকিশোরকে বললুম, তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝ।

তাই হল। তার নিজেরই উন্মাদ হল। তখন সে কেবল ওঁ ওঁ বলত আর এক ঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বলল, ওগো, আমার রোগ আরাম করো, কিন্তু দেখো ওঁকারটি যেন আরাম কোরো না।

রোগাদির জন্য তুলসী দিচ্ছে, কৃষ্ণকিশোর দেখে অবাক। আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যাই যেতুম, আমাকে দেখে নৃত্য। একদিন গিয়ে দেখি বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি হয়েছে? বলল, টেক্‌সওয়ালা এসেছিল, তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি বাটি বেচে লবে। আমি বললুম, কি হবে ভেবে। না হয় ঘটি বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায়, তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো। কৃষ্ণকিশোর বলত, আমি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়ত কি না। মাঝে মাঝে তাকে 'তুমি খ' বলে ঠাট্টা করতুম। আমি হেসে বললুম, তুমি 'খ', টাক্‌স তোমাকে তো টানতে পারবে না।

কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, 'মরা মরা' শুদ্ধ মন্ত্র—ঋষি দিয়েছেন বলে। 'ম' মানে ঈশ্বর, 'রা' মানে জগৎ। তাই আগে বাল্মীকির মত সব ত্যাগ করে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। আগে দরকার ঈশ্বর-দর্শন। তারপর বিচার শাস্ত্রজগৎ।

কৃষ্ণকিশোরকে দেখলুম একাদশীতে লুচি ছক্কা খেলে। আমি হৃদুকে বললুম, হৃদু, আমার কৃষ্ণকিশোরের একাদশী করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাই একদিন করলুম। খুব পেট ভরে খেলুম, তার পরদিন আর কিছু খেতে পারলুম না।

মাকে বললুম, মা, এরকম অবস্থা যদি করলে, তাহলে একজন বড়মানুষ জুটিয়ে দাও। তাই সেজবাবু চৌদ্দ বছর ধরে সেবা করলে। সে কত কি! আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে—সাধুসেবার জন্য গাড়ি-পাল্‌কী—যাকে যাকে যা যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া।

সেজবাবু বললে, তোমার ভিতরে আর কিছু নেই—সেই ঈশ্বর আছেন। দেহটা কেবল খোলমাত্র—যেমন বাহিরে কুমড়োর আকার কিন্তু ভিতরে শাঁস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখলুম, যেন ঘোমটা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছে। অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল। বললে, বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব। প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে। চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই। এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই। এই বলে আর কাঁদে। আমি বললুম, আমি তো কই কিছু জানি না বাবু। কিন্তু সে কি শোনে। ভয় হল পাছে একথা কেউ জেনে গিন্নীকে, রাণী রাসমণিকে বলে দেয়। সেই বা কি ভাববে—হয়তো বলবে কিছু গুণটুন করেছে। অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়। সেজবাবু কি সাধে এতটা করত—ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। মথুরের ঠিকুজিতে কিন্তু লেখা ছিল বাবু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।

সেজবাবু বলেছিল, ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই। আমি বললুম, ও কি কথা তোমার! যার আইন, ইচ্ছা করলে সে তখনি তা রদ করতে পারে, তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে। ওকথা সে কিছুতেই মানলে না। বললে, লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদাফুল কখনও হয় না, কেন না তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কই, লালফুলের গাছে সাদাফুল তিনি এখন করুন দেখি। আমি বললুম, তিনি ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন, তাও করতে পারেন। সে কিন্তু ওকথা নিলে না। তার পরদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে গেছি, দেখি যে একটা লাল জবাফুলের গাছে একই ডালে দুটো ফেঁকড়িতে দুটো ফুল, একটি লাল আর একটি ধবধবে সাদা, একছিটেও লাল দাগ তাতে নেই। দেখেই ডালটি শুদ্ধ ভেঙ্গে এনে সেজবাবুর সামনে ফেলে দিয়ে বললুম, এই দেখ। তখন সে বললে, হ্যাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে।

যখন রাধাকান্তের (দক্ষিণেশ্বরে) গয়না চুরি গেল, সেজবাবু রাধাকান্তের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরকে বলতে লাগল, ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না। আমি সেজবাবুকে বললুম, ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যার দাসী, পদসেবা করেন, তাঁর কি ঐশ্বর্যের অভাব। এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিষ, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে কতকগুলো মাটির ড্যালা। ছি, অমন হীনবুদ্ধির কথা বলতে নাই, কি ঐশ্বর্য তুমি তাকে দিতে পার?

পাছে অহংকার হয় বলে গৌরী (পণ্ডিত) আমি বলত না, বলত 'ইনি'। আমিও তার দেখাদেখি বলতুম 'ইনি'। আমি খেয়েছি না বলে বলতুম ইনি খেয়েছেন। সেজবাবু তাই দেখে একদিন বললে, সে কি বাবা, তুমি ওসব কেন বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহংকার আছে। তোমার তো আর অহংকার নাই। তোমার ওসব বলায় কিছুই দরকার নাই।

৮॥ আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাত করে সেজবাবুর কাছে আনালুম। সেজবাবু খুব যত্নখাঁতির করলে। রূপার বাসন বার করে জলখাওয়া পর্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে কি— আমাদের কেশবমন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। সেজবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠল। আমি আবার বৈষ্ণব-চরণের গা টিপি।

সেজবাবুর সঙ্গে আর এক জায়গায় গিয়েছিলুম। অনেক পণ্ডিত আমার সঙ্গে বিচার করতে এসেছিল। আমি তো মুখ্যু। তারা আমার সেই অবস্থা দেখলে আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বলল, মহাশয়, আগে যা পড়েছি, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে সে-সব পড়া-বিদ্যা, সব থু হয়ে গেল। এখন বুঝেছি, তার কৃপা হলে জ্ঞানের অভাব থাকে না। মূর্খ বিদ্বান্ হয়, বোবার কথা ফোটে।

একদিন শুনলুম বাগবাজারের পোলের কাছে দীন মুখুজ্জ্যে বলে একটি ভাল লোক আছে। ভক্ত। সেজবাবুকে ধরলুম, আমি দীন মুখুজ্জ্যের বাড়ি যাব। সেজবাবু কি করে, গাড়ি করে নিয়ে গেল। বাড়িটি ছোট। আবার মস্ত গাড়ি করে এক বড়মানুষ এসেছে। তারাও অপ্রস্তুত, আমরাও অপ্রস্তুত। তার আবার ছেলের পৈতে। কোথায় বসায়? আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছিলুম, তা বলে উঠল, ও ঘরে মেয়েরা, যাবেন না। মহা অপ্রস্তুত। সেজবাবু

ফিরবার সময় বললে, বাবা, তোমার কথা আর শুনব না। আমি হাসতে লাগলুম।

আবার সেজবাবুর সঙ্গে দেবেন ঠাকুরকে দেখতে গিছলুম। একদিন ধরে বসলুম দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি যাব। সেজবাবুকে বললুম, আমি শুনেছি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করে, আমার তাকে দেখবার ইচ্ছা হয়। আমায় লয়ে যাবে? সেজবাবু—তার আবার ভারি অভিমান, সে সেধে লোকের বাড়ি যাবে? এগু পেছু করতে লাগল। তারপর বলল, আচ্ছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাবো। আমরা হিন্দু কলেজে এক সঙ্গে পড়েছিলুম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব আছে।

সেজবাবুর সঙ্গে (দেবেন্দ্র ঠাকুরের) অনেকদিন পরে দেখা হল দেখে দেবেন্দ্র বলল, তোমার একটু বদলেছে, তোমার ভুঁড়ি হয়েছে। সেজবাবু আমার কথা বলল, ইনি তোমায় দেখতে এসেছেন—ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। আমি লক্ষণ দেখবার জন্য দেবেন্দ্রকে বললুম, দেখি গা, তোমার গা। দেবেন্দ্র গায়ের জামা তুললে দেখলুম, গৌরবর্ণ, তার উপর সিঁদুর ছড়ানো। তখন দেবেন্দ্রের চুল পাকে নাই।

প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখেছিলুম। তা হবে না গা। অত ঐশ্বর্য, বিদ্যা, মান, সম্ভ্রম। অভিমান দেখে সেজবাবুকে বললুম, আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তার কি 'আমি পণ্ডিত আমি জ্ঞানী আমি ধনী' বলে অভিমান থাকতে পারে?

দেবেন্দ্রের সঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটি হল। সেই অবস্থাটি হলে কে কিরূপ লোক দেখতে পাই। আমার ভিতর থেকে হী হী করে একটা হাসি উঠল। যখন ঐ অবস্থা হয় তখন পণ্ডিত ফণ্ডিত তৃণজ্ঞান হয়। যদি দেখি পণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য নাই তখন খড়কুটোর মত বোধ হয়। তখন দেখি যে শকুনি যেন খুব উঁচুতে উঠেছে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে নজর। দেখলুম

যোগ-ভোগ দুই-ই আছে। অনেক ছেলেপুলে, ছোট ছোট। ডাক্তার এসেছে। তবেই হল, অত জ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বদা থাকতে হয়। বললুম, তুমি কলির জনক। জনক এদিক উদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি। তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরে মন রেখেছ শুনে তোমায় দেখতে এসেছি। আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শোনাও।

তখন বেদ থেকে কিছু কিছু শোনালে। বললে, এই জগৎ যেন একটি ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে এক একটি ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটীতে যখন ধ্যান করতুম ঠিক ঐ রকম দেখেছিলুম। দেবেন্দ্রের কথার সঙ্গে মিলল দেখে ভাবলুম, তবে তো খুব বড়লোক। ব্যাখ্যা করতে বললুম, তা বললে, এ জগৎ কে জানত? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য। ঝাড়ের আলো না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।

অনেক কথাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুশি হয়ে বললে, আপনাকে উৎসবে আসতে হবে। আমি বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার তো এই অবস্থা দেখছ। কখন কি ভাবে তিনি রাখেন। দেবেন্দ্র বললে, না, আসতে হবে। তবে ধুতি আর উড়ানি পরে এসো— তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে। আমি বললুম, তা পারব না, আমি বাবু হতে পারব না। দেবেন্দ্র সেজবাবু সব হাসতে লাগল। তার পরদিনই সেজবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো—আমাকে উৎসব দেখতে যেতে বারণ করেছে; বলে, অসভ্যতা হবে, গায়ে উড়ানি থাকবে না।

সেজবাবুর ভাব হল। সর্বদাই মাতালের মত থাকে। কোনও কাজ করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এ রকম হলে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভটচাজ্জি নিশ্চয় কোনো তুক করেছে। আমায় ডেকে পাঠিয়েছে, গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়। চক্ষু লাল, জল পড়ছে। ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। আর বুক থরথর করে কাঁপছে। আমায় দেখে একেবারে পা দুটো

জড়িয়ে ধরে বললে, বাবা ঘাট হয়েছে। আজ তিনদিন ধরে এই রকম, বিষয়কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতে মন যায় না। সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে। বললুম, কেন, তুমি যে ভাব হোক্ বলেছিলে। তখন সে বললে, বলেছিলুম, আনন্দও আছে। কিন্তু হলে কি হয়, এদিকে যে সব যায়। বাবা, ও তোমার ভাব তোমাকেই সাজে। আমাদের ওসবে কাজ নেই। ফিরিয়ে নাও। তখন আমি হাসি আর বলি, তোমাকে তো একথা আগেই বলেছি। সে বললে, হ্যাঁ বাবা, কিন্তু তখন কি অতশত জানি যে ভূতের মত ঘাড়ে এসে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমায় চব্বিশ ঘণ্টা ফিরতে হবে, ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারব না।

তখন তার বুকে আবার হাত বুলিয়ে দি।

সেজবাবুকে বলেছিলুম, তুমি মনে কোরো না, তুমি একটা বড় মানুষ, আমায় মানছ বলে আমি কৃতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো।

দ্বিতীয় পর্ব । ১৮৬০-১৮৭৭

সাধনা ও সিদ্ধি

১ ॥ তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম পুরাণমতের, তারপর তন্ত্রমতের, আবার বেদমতের। প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা করতুম। তুলসীকানন হল। তার মধ্যে বসে ধ্যান করতুম। কখনও ব্যাকুল হয়ে 'মা মা' বলে ডাকতুম বা 'রাম রাম' করতুম।

তন্ত্রমতের সাধনা বেলতলায়। তখন তুলসীগাছ সজনে খাড়া এক মনে হত। বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে। আবার···আসন। বামনী সব যোগাড় করত।

সে অবস্থায় শিবানীর উচ্ছিষ্ট—সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে—তা সাপে খেলে কি কিসে খেলে ঠিক নাই—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার। কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতুম, আর নিজেও খেতুম। সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ। মাটিতে জল জমবে তাই আচমন। আমি সে মাটিতে পুকুর থেকে জল দিয়ে আচমন করতুম। অবিদ্যাকে নাশ না করলে হবে না। আমি তাই বাঘ হতুম—হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতুম।

একদিন দেখি বামনী রাতের বেলা কোত্থেকে এক সুন্দরী যুবতীকে ডেকে এনেছে। পূজার সব আয়োজন করে তাকে দেবীর আসনে বসিয়ে আমায় বলল, বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে এর কোলে বসে তন্ময় চিত্তে জপ কর। তখন আতঙ্কে কেঁদে মাকে বললুম, মা, তোর শরণাগতকে একি আদেশ করছিস্? আমি তোর

দুর্বল সন্তান, এ শক্তি আমার কোথায় ? ঐরূপ বলতেই মনে কি এক আশ্চর্য্য শক্তি এল। আবিষ্টের মত কি করছি না জেনেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তার কোলে গিয়ে বসলুম আর অমনি সমাধি হয়ে গেল। যখন হুঁশ হল, বামনী বলল, বাবা, অন্য কেউ হলে এ অবস্থায় অতিকষ্টে খানিকক্ষণ জপ করেই ক্ষান্ত হত, কিন্তু তোমার দেহবোধ ছিল না, একেবারে সমাধি হয়ে গিছল। শুনে হাপ ছেড়ে বাঁচলুম আর মাকে বারবার প্রণাম করতে লাগলুম।

আর একদিন দেখি, বামনী মড়ার খুলিতে মাছ রান্না করে মাকে নিবেদন করলে, আর আমাকে দিয়েও ঐ রকম করিয়ে প্রসাদ নিতে বললে। তার আদেশে তাই করলুম, মনে কোনো ঘৃণা হল না। কিন্তু যেদিন সে গলিত মাংসের টুকরো এনে নিবেদন করে জিহ্বায় স্পর্শ করতে বললে, সেদিন কিন্তু বড় ঘৃণা হল। বললুম, তা কি কখনো করা যায় ? শুনে সে বলল, সে কি বাবা, এই দেখ আমি করছি। বলেই সে নিজের মুখে দিল। তারপর 'ঘৃণা করতে নাই' বলে কিছুটা অংশ আমার সামনে ধরল। তখন মায়ের চণ্ডীমূর্তির উদ্দীপন হল আর 'মা মা' বলতে বলতে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লুম। সে অবস্থায় বামনী তা মুখে দিলেও আর ঘৃণা হল না।

এভাবে বামনী যে কতরকম অনুষ্ঠান করিয়েছিল তার হিসেব নেই। সব কথা সব সময় মনেও আসে না। তবে মনে আছে যে-দিন নরনারীর সম্ভোগানন্দ দেখে শিবশক্তির লীলাজ্ঞানে সমাধিস্থ হয়েছিলুম, সেদিন চেতনা হলে বামনী বলেছিল, বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হয়ে দিব্যভাবে স্থিত হলে। এই হচ্ছে এ মতের শেষ সাধন। এর কিছুদিন পরে একজন ভৈরবীকে পাঁচসিকা দক্ষিণা দিয়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিনের বেলা সকলের সামনে কুলাগারপূজার আয়োজন করে বীরভাবের সাধনা সম্পূর্ণ করলুম।

বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সবগুলিই বামনী একে একে করিয়েছিল। কঠিন কঠিন

সাধন—যা করতে গিয়ে বেশির ভাগ সাধকই ভুল পথে চলে যায়। মার কৃপায় সে সবেই উত্তীর্ণ হয়েছি।

এই অবস্থা যখন হল, ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল। ষট্‌চক্রের এক একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে আর অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হয়ে ওঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল।

কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে চৈতন্য হয় না। মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী। চৈতন্য হলে তিনি সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়ে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এইসব চক্র ভেদ করে শেষে শিরোমধ্যে গিয়ে পড়েন। এরই নাম মহাবায়ুর গতি—তবেই শেষে সমাধি হয়। শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না—তাকে ডাকতে হয়। ব্যাকুল হলে তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে জ্ঞানের কথা, তাতে কি হবে!

এই অবস্থা যখন হল, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে, কিরূপে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ হয়। ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগল আর সমাধি হল। এ অতি গুহ্য কথা। দেখলুম ঠিক আমার মতন বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা, সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে জিহ্বা দিয়ে পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে। প্রথমে গুহ্য লিঙ্গ নাভি। চতুর্দ্দল, ষড়দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল—ঊর্ধ্বমুখ হল। হৃদয়ে যখন এলো, বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখ পদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হল আর প্রস্ফুটিত হল। তারপর কণ্ঠে ষোড়শদল আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হল। সেই অবধি আমার এই অবস্থা।

সে অবস্থায় অদ্ভুত সব দর্শন হত। আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখলুম। এ সময় একটা বিপরীত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। যতই কেন খাই না, পেট কিছুতেই যেন ভরত না। এই খেয়ে উঠলুম আবার তখনি যেন কিছু খাই নাই—সমান খাবার ইচ্ছা। দিন-রাত্তির কেবল খাই-খাই ইচ্ছা—তার আর বিরাম নেই। ভাবলুম,

এ আবার কি ব্যারাম হল? বামনীকে বললুম। সে বলল, বাবা, ভয় নেই, ঈশ্বরপথের পথিকদের ওরকম অবস্থা কখনো কখনো হয়ে থাকে, শাস্ত্রে একথা আছে। আমি তোমার ওটা ভাল করে দিচ্ছি। এই বলে, সেজবাবুকে বলে ঘরের ভিতর চিঁড়ে-মুড়কি থেকে সন্দেশ রসগোল্লা লুচি অবধি যতরকম খাবার আছে, সব থরে থরে সাজিয়ে রাখলে আর বললে, বাবা, তুমি এই ঘরে দিন-রাত্তির থাকো আর যখন যা ইচ্ছা হবে তখনই তা খাও। সেই ঘরে থাকি, বেড়াই। সেই সব খাবার দেখি, নাড়িচাড়ি। কখনও এটা থেকে কিছু খাই, কখনও ওটা থেকে কিছু খাই। এই রকমে তিনদিন কেটে যাবার পর সে বিপরীত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছাটা চলে গেল, তবে বাঁচি।

আমার সাক্ষাৎ ঐসব অবস্থা হত। কুঠীর পেছন দিয়ে যেতে যেতে গায়ে যেন হোমাগ্নি জ্বলে গেল। যখন সেই অবস্থা আসত, শির-ডাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে যেত। 'প্রাণ যায় প্রাণ যায়' এই করতুম। কিন্তু তার পরে খুব আনন্দ। সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমনি, আগে যন্ত্রণাও তেমনি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব। এইভাব দেহমনকে তোলপাড় করে দেয়। যেন একটা বুড় হাতী কুঁড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়। হয়তো ভেঙ্গে-চুরে যায়। ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি সামান্য নয়। আমি এই অবস্থায় তিনদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলুম। নড়তে চড়তে পারতুম না, একজায়গায় পড়েছিলুম। হুঁশ হলে বামনী আমায় ধরে স্নান করাতে নিয়ে যেত। কিন্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছল। গায়ে যে-সব মাটি লেগেছিল, পুড়ে গিছল।

আগে কইমাছ জীইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য্য হতুম। মনে করতুম, এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা করবে। অবস্থা যখন বদলাতে লাগল, তখন দেখি যে শরীরগুলো খোলমাত্র। থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না।

পদ্মলোচন ভারী জ্ঞানী ছিল। কিন্তু আমি ‘মা মা’ করতুম, তবু আমায় খুব মানতো। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলকাতায় এসেছিল, এসে কামারহাটির কাছে একটি বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হল। হৃদেকে পাঠিয়ে দিলুম জানতে, অভিমান আছে কিনা। শুনলুম, পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দেখা হল। এত জ্ঞানী আর পণ্ডিত, তবু আমার মুখে রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না। কথা কয়ে এমন সুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বললে, ভক্তের সঙ্গ করব—এ কামনা ত্যাগ কর, নচেৎ নানারকমের লোক তোমায় পতিত করবে। বৈষ্ণবচরণের গুরু উৎসবানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল। আমায় আবার বললে, আপনি একটু শুনুন। একটা সভায় বিচার হয়েছিল, শিব বড়, না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করলে। পদ্মলোচন এমনি সরল, সে বললে, আমার চৌদ্দপুরুষ শিবও দেখে নাই, ব্রহ্মাও দেখে নাই। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একদিন বললে, ও সব ত্যাগ করেছ কেন? এটা মাটি, এটা টাকা—এ ভেদবুদ্ধি তো অজ্ঞান থেকে হয়। আমি কি বলব, বললুম, কে জানে বাপু, আমার টাকা-কড়ি ওসব ভাল লাগে না।

পদ্মলোচন অতবড় পণ্ডিত হয়েও এখানে এতটা বিশ্বাস-ভক্তি করত। সেজবাবু যত পণ্ডিতদের ডাকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে এক সভার যোগাড় করেছিল (অন্নমেরু উৎসবে)। পদ্মলোচন নির্লোভ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সভায় আসবে না ভেবে আসবার জন্য অনুরোধ করতে বলেছিল। সেজবাবুর কথায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, হ্যাঁগা, তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে না? তাইতে বলেছিল, তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়ীতে সভায় যাবো তার আর কি? তোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ি গিয়ে খেতে পারি।

বলেছিল, আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে সভা করে সকলকে বলব, তুমি ঈশ্বরাবতার। আমার কথা কে কাটতে পারে দেখব। তারপর কিন্তু তার মৃত্যু হল।

২ ॥ রেল হবার আগে যত সাধুরা সব গঙ্গার ধার দিয়ে হাঁটা-পথ ধরে সাগরে চান করতে ও জগন্নাথ দেখতে আসত। রাসমণির বাগানে ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে অন্ততঃ দুচারদিন থাকা, বিশ্রাম করা, তারা সবাই করতোই করতো। কেউ কেউ আবার কিছুকাল থেকেই যেতো।

রাসমণির বাগানে ভিক্ষার সুবিধা, মা গঙ্গার কৃপায় জলেরও অভাব নেই। আবার কাছেই মনের মত 'দিশা-জঙ্গল'। কাজেই সাধুরা তখন এখানেই ডেরা করত। এক এক সময়ে এক এক রকম সাধুর ভিড় লেগে যেত। এক সময় সন্ন্যাসী পরমহংসই যত আসতে লাগল। পেট-বৈরাগীর দল নয়—সব ভাল ভাল লোক।

এই রকম করে কতদিন গেল। তারপর তাদের যাওয়া-আসাটা কমে গেল। তারা গিয়ে আসতে লাগল যত রামাৎ বাবাজী। দলে দলে আসতে লাগল। তাদের সব কি ভক্তি-বিশ্বাস, কি সেবায় নিষ্ঠা! তাদের একজনার কাছ থেকেই তো রামলালা আমার কাছে এসে গেল।

সে বাবাজী (জটাধারী) এ ঠাকুরটির চিরকাল সেবা করত। যেখানে যেত, সঙ্গে করে নিয়ে যেত। তাকে (রামলালাকে) ভোগ দিত। শুধু তাই নয়, সে দেখতে পেত, রামলালা সত্যি সত্যি খাচ্ছে বা কোনো একটা জিনিষ খেতে চাচ্ছে, বেড়াতে যেতে চাচ্ছে, আবদার করছে। আর ঐ ঠাকুরটি নিয়েই সে আনন্দে বিভোর, মস্ত

হয়ে থাকত। আমিও দেখতে পেতুম, রামলালা ঐসব করছে। আর রোজ সেই বাবাজীর কাছে চব্বিশঘণ্টা বসে থাকতুম আর রামলালাকে দেখতুম।

দিনের পর দিন যত যেতে লাগল, রামলালারও তত আমার উপর পিরীত বাড়তে লাগল। যতক্ষণ বাবাজীর কাছে থাকি ততক্ষণ সেখানে সে বেশ থাকে—খেলাধুলা করে। আর যাই সেখান থেকে নিজের ঘরে চলে আসি, তখন সেও সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে। আমি বারণ করলেও সাধুর কাছে থাকে না। প্রথম প্রথম ভাবতুম বুঝি মাথার খেয়ালে ঐ রকমটা দেখি। নইলে তার চিরকেলে পুজো-করা ঠাকুর, ঠাকুরটিকে সে কত ভালবাসে, ভক্তি ক'রে যত্ন ক'রে সেবা ক'রে; সে ঠাকুর তার চেয়ে আমায় ভালবাসবে—এটা কি হতে পারে? কিন্তু ওরকম ভাবলে কি হবে? দেখতুম, সত্যি সত্যি দেখতুম, রামলালা সঙ্গে সঙ্গে, কখনো আগে কখনো পেছনে, নাচতে নাচতে আসছে। কখনো বা কোলে উঠবার জন্য আবদার করছে। আবার হয়তো কখনো বা কোলে করে রয়েছি, কিছুতেই কোলে থাকবে না, কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে। কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়বে। যত বারণ করি, ওরে অমন করিস্ নি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে। ওরে অত জল ঘাঁটিস্ নি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে—সে কি তা শোনে? যেন কে কাকে বলছে। হয়তো আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগল, আর আরো দুরন্তপনা করতে লাগল। হয়তো বা ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে মুখভঙ্গী করে ভ্যাঙ্চাতে লাগল। তখন সত্যি সত্যি রেগে বলতুম, তবে রে পাজি, রোস—আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। বলে রোদ থেকে বা জল থেকে জোর করে টেনে নিয়ে আসি, আর এ-জিনিসটা ও-জিনিসটা দিয়ে ভুলিয়ে ঘরের মধ্যে খেলতে বলি। আবার কখনো বা কিছুতেই দুষ্টামি থামছে না দেখে চড়টা চাপড়টা বসিয়েই দিতুম। মার খেয়ে সুন্দর

ঠোঁট দু'খানি ফুলিয়ে সজল নয়নে আমার দিকে দেখত। তখন আবার মনে কষ্ট হ্ত। কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভোলাতুম। এ রকম সব ঠিকঠিক দেখতুম, করতুম।

একদিন নাইতে যাচ্ছি, বায়না ধরলে সেও যাবে। কি করি, নিয়ে গেলুম। তারপর জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না, যত বলি কিছুতেই শোনে না। শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বললুম—তবে নে, কত জল ঘাঁটতে চাস্ ঘাঁট। আর সত্য সত্য দেখলুম সে জলের ভিতর হাঁপিয়ে শিউরে উঠল। তখন আবার তার কষ্ট দেখে, কি করলুম বলে কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি।

আর একদিন তার জন্য মনে যে কষ্ট হয়েছিল, কত যে কেঁদেছিলুম, তা বলবার নয়। সেদিন রামলালা বায়না করছে দেখে ভোলাবার জন্য চারটি ধানসুদ্ধ খই খেতে দিয়েছিলুম। তারপর দেখি ঐ খই খেতে খেতে ধানের তুষ লেগে তার নরম জিব চিরে গেছে। তখন মনে যে কষ্ট হল। তাকে কোলে করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলুম।

এক একদিন রেঁধে বেড়ে ভোগ দিতে বসে বাবাজী রামলালাকে দেখতেই পেত না। তখন মনের দুঃখে এখানে ছুটে আসত। এসে দেখত রামলালা এঘরে খেলা করছে। তখন অভিমানে তাকে কত কি বলত। বলত, আমি এত করে রেঁধে বেড়ে তোকে খাওয়াব বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই কিনা এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে রয়েছিস্। তোর ধারাই এমনি, যা ইচ্ছা তাই করবি। মায়া-দয়া কিছুই নেই। বাপ মাকে ছেড়ে বনে গেলি, বাপটা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, তবুও ফিরলি না—তাকে দেখা দিলি না। এ রকম সব কত কি বলত, আর রামলালাকে টেনে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। এই রকমে দিন যেতে লাগল। সাধু এখানে অনেকদিন ছিল—কারণ রামলালা এখান ছেড়ে যেতে চায় না। আর সেও চিরকালের আদরের রামলালাকে ফেলে যেতে পারে না।

তারপর একদিন বাবাজী এসে কেঁদে বলল, রামলালা আমায় কৃপা করেছে। আশ মিটিয়ে যেমন করে দেখতে চাইতুম তেমনি করে দেখা দিয়েছে। আর বলেছে, এখান থেকে যাবে না। তোমায় ছেড়ে কিছুতেই যেতে চায় না। তা, আমার মনে আর দুঃখকষ্ট নাই। তোমার কাছে সুখে থাকে, আনন্দে খেলাধূলো করে, তাই দেখে আমি আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই। এখন আমার এমনটা হয়েছে যে ওর যাতে সুখ, তাতেই আমার সুখ। তাই আমি এখন একে তোমার কাছে রেখে চলে যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে। এই বলে রামলালাকে আমায় দিয়ে বিদায় নিলে। সেই অবধি রামলালা এখানে রয়েছে।

আমি রাম রাম করে পাগল হয়েছিলুম। সন্ন্যাসীর ঠাকুর রামলালাকে লয়ে লয়ে বেড়াতুম। তাকে নাওয়াতুম, খাওয়াতুম, শোয়াতুম। যেখানে যাব সঙ্গে করে লয়ে যেতুম। রামলালা রামলালা করে পাগল হয়ে গেলুম। দক্ষিণেশ্বরে রামমন্ত্র লয়েছিলুম। দীর্ঘ ফোঁটা, গলায় হীরা। আবার কদিন পরে সব দূর করে দিলুম।

কি অবস্থা গেছে! হরগৌরীভাবে কতদিন ছিলুম, আবার কতদিন রাধাকৃষ্ণভাবে। কখনো সীতারামের ভাবে। রাধার ভাবে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করতুম, সীতার ভাবে 'রাম রাম' করতুম। সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতুম আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হত। আবার কখনো রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতুম। ঐরূপ সর্বদা দর্শন হত। আবার কখনো গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতুম। দুইভাবের মিলন— পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হত।

আমি মার দাসীভাবে সখীভাবে দুই বৎসর ছিলুম। সখীভাবে অনেকদিন ছিলুম। বলতুম, আমি আনন্দময়ী, ব্রহ্মময়ীর দাসী। ওগো দাসীরা, তোমরা আমায় দাসী কর। আমি গরব করে চলে

যাব বলতে বলতে যে আমি ব্রহ্মময়ীর দাসী। তখন মেয়েদের মত কাপড় গয়না ওড়না পরতুম। ওড়না গায়ে দিয়ে আরতি করতুম। তা না হলে পরিবারকে আটমাস কাছে এনে রেখেছিলুম কেমন করে? দুজনেই মার সখী। একদিন ভাবে রয়েছি, পরিবার জিজ্ঞাসা করলে, আমি তোমার কে? আমি বললুম, আনন্দময়ী।

মেয়েদের কাপড় ওড়না এইসব পরতুম, আবার নথ পরতুম। মেয়ের ভাব থাকলে কামজয় হয়। সেই আদ্যাশক্তির পূজা করতে হয়। তিনিই মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন।

সেজবাবু জানবাজারের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দিনকতক রাখলে। দেখতে লাগলুম, সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। বাড়ির মেয়েরা আদপেই লজ্জা করত না। যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে দেখলে কেউ লজ্জা করে না। আন্দির সঙ্গে বাবুর মেয়েকে জামাইয়ের কাছে শোয়াতে যেতুম।

আবার অবস্থা বদলে গেল। তখন লীলা ত্যাগ করে নিত্যতে মন উঠে গেল। সজনে তুলসী সব এক বোধ হতে লাগল। ঈশ্বরীয় রূপ আর ভাল লাগল না। বললুম, কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে। তখন তাদের তলায় রাখলুম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেললুম। কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সেই আদি পুরুষকে চিন্তা করতে লাগলুম। নিজে দাসীভাবে রইলুম— পুরুষের দাসী।

তখন-তখন এমন রূপ হয়েছিল যে লোকে চেয়ে থাকত। জ্যোতিতে দেহ জ্বলজ্বল করত। বুক মুখ সবসময় লাল হয়ে থাকত। লোকে চেয়ে থাকত বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, মা, তোর বাইরের রূপ তুই নে, আমায় ভিতরের রূপ দে। গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলতুম, ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা। তবে কতদিন পরে উপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল। তাই এখন এই হীন দেহ।

৩॥ আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম। ন্যাংটা বেদান্তের উপদেশ দিলে। তিনদিনেই সমাধি। মাধবীতলায় ঐ সমাধি দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে বললে, আরে, এ কেয়া রে! পরে সে বুঝতে পারলে এর ভিতর কে আছে। তখন আমায় বলে, তুমি আমায় ছেড়ে দাও। ওকথা শুনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল। আমি সেই অবস্থায় বললুম, বেদান্তবোধ না হলে তোমার যাবার যো নাই। তখন রাতদিন তার কাছে কেবল বেদান্ত। এগার মাস বেদান্ত শোনালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা'। মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেছি অমনি মার মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল। তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পারে আগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। যতবার মন থেকে সব জিনিষ তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি, ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম। তখন মনে আর কিছুই রইল না—হু হু করে একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছুল।

ন্যাংটা আমায় শেখাতো—উপদেশ দিত, গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'গীতা গীতা' দশবার বলতে বলতে

'ত্যাগী ত্যাগী' হয়ে যায়। কিরূপে স্ব-স্বরূপে থাকা যায় ন্যাংটা উপদেশ দিত, মন বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্ব-স্বরূপে থাকবে।

ন্যাংটার কাছে বেদান্ত শুনেছিলুম, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বাজিকর এসে কত বাজি করে, আমের চারা, আম পর্যন্ত হল। কিন্তু এসব বাজি। বাজিকরই সত্য। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কিরূপ? যেমন অনন্ত সাগর—উর্ধ্বে নীচে, ডাইনে বামে জলে জল। কারণ-সলিল। জল স্থির, কার্য হলে তরঙ্গ। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়—কার্য। আবার বলত, বিচার যেখানে গিয়ে থেমে যায়, সে-ই ব্রহ্ম। যেমন কর্পূর জ্বালালে পুড়ে যায়, একটু ছাইও থাকে না। ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো। এসে আর খবর দিলে না। সমুদ্রতেই গলে গেল। মনেই জগৎ আবার মনেই লয় হয়। জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ন্যাংটা বলত। জলে জল, অধঃ উর্ধ্ব পরিপূর্ণ। জীব যেন মীন, জলে আনন্দে সে সাঁতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্যসত্য দেখবে। সিদ্ধাই থাকা এক মহা গোল। ন্যাংটা আমায় শেখালে।

কালীঘরে একদিন ন্যাংটা আর হলধারী অধ্যাত্ম পড়ছে, হঠাৎ দেখলুম নদী, তার পাশে বন, সবুজ রং গাছপালা, রাম-লক্ষ্মণ জাঙ্গিয়া পরে চলে যাচ্ছেন। পঞ্চবটীতে ন্যাংটার কাছে আমি গান গেয়েছিলুম, 'জীব, সাজ সমরে / রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।' আর একটা গান—'দোষ কারু নয় গো মা / আমি স্বখাত-সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।' যখন গান করতুম, ন্যাংটা কাঁদত, বলত, আরে, কেয়া রে। দেখ অতবড় জ্ঞানী, কেঁদে ফেলত। গীতা, ভাগবত যেখানে যা, সে ফস্ করে বুঝে নিত। বলত, তাদের মঠে একজন সিদ্ধ ছিল। সে আকাশ তাকিয়ে চলে যেত। গণেশ গর্জী-সঙ্গী যেতে বড় দুঃখ—অধৈর্য্য হয়ে গিছলো। ন্যাংটা বলত, মতের জন্য সাধুসেবা হল না। এক জায়গায় ভাণ্ডারা হচ্ছিল। অনেক

সাধু-সম্প্রদায়, সবাই বলে আমাদের সেবা আগে, তারপর অন্য সম্প্রদায়। কিছুই মীমাংসা হল না, শেষে সকলে চলে গেল। আর বেশ্যাদের খাওয়ানো হল।

ন্যাংটা বলত, তাদের দলে সাতাশ ন্যাংটা ছিল। যারা প্রথম ধ্যান শিখতে সুরু করেছে তাদের গদির উপর বসিয়ে ধ্যান করাতো। কেন না, কঠিন আসনে বসে ধ্যান করতে পা টন্‌টন্‌ করবে। আর ঐ টন্‌টনানিতে মন ঈশ্বরে না গিয়ে দেহের দিকে এসে পড়বে। তারপর তার ধ্যান যত জমতো ততই তাকে কঠিন কঠিন আসনে বসতে দেওয়া হত। শেষকালে শুধু চর্ম্মাসন ও খালি মাটি। খাওয়া-দাওয়া সবেতেই ঐরূপ নিয়ম। পরনের ব্যাপারেও সবাইকে ক্রমে ক্রমে ন্যাংটা হয়ে থাকতে অভ্যাস করানো হত। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত, কুল, শীল, মান—এসব অষ্টপাশে মানুষ জন্ম থেকেই আবদ্ধ আছে কিনা। এক এক করে সেগুলো সব ত্যাগ করানো হত। তারপর মন পাকা হলে প্রথমে সদলে, পরে একা একা তীর্থে তীর্থে ঘুরে আসতে হত। ন্যাংটাদের এইরকম সব নিয়ম ছিল।

ন্যাংটা বলত, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে দর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে। তা না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত, তবে সূর্য মাথার উপর এলে ছায়া আধহাতের মধ্যে থাকে। বলত, এই সময় এই গভীর রাতে অনাহত শব্দ শোনা যায়। বলত, মন বিলাতে নাহি।

ন্যাংটা অতবড় জ্ঞানী, সে-ই জলে ডুবতে গিছল। এখানে এগারো মাস ছিল। পেটের ব্যারাম হল, রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গঙ্গাতে ডুবতে গিছল। ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া। যত যায়, হাঁটুজলের চেয়ে আর বেশী হয় না। তখন আবার বুঝলে, বুঝে ফিরে এলো।

বেদমন্ত্র সাধনের সময় সন্ন্যাস নিলুম। তখন চাঁদনীতে পড়ে থাকতুম—হৃদুকে বলতুম, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, চাঁদনীতে ভাত খাবো। হত্যা দিয়ে পড়েছিলুম। মাকে বললুম, আমি মুখ্যু, তুমি আমায় জানিয়ে দাও—বেদ পুরাণ তন্ত্রে, নানাশাস্ত্রে কি আছে মা বললেন, বেদান্তের সার ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কথা বেদে আছে তাকে তন্ত্রে বলে সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ—আবার তাকেই পুরাণে বলে সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে, সে সব হয়েছিল। বালকবৎ উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বৎ। আর শাস্ত্রে যেরূপ আছে সেরূপ দর্শনও হত।

কখনও দেখতুম জগৎময় আগুনের স্ফুলিঙ্গ। কখনও চারদিকে যেন পারার হ্রদ—ঝক্‌ঝক্ করছে। আবার কখনও রূপা গলার মত দেখতুম। কখনও দেখতুম রংমশালের আলো যেন জ্বলছে। আবার দেখালে তিনিই জীবজগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। ছাদে উঠে আবার সিঁড়িতে নামা। অনুলোম বিলোম।

একটা অবস্থা যায় তো আর একটা অবস্থা আসে। যেন ঢেঁকির পাট। একদিক নীচু হয় তো আর একদিক উঁচু হয়। যখন অন্তর্মুখ সমাধিস্থ, তখনও দেখছি তিনি। আবার যখন বাহিরের জগতে মন এলো তখনও দেখছি তিনি। যখন আরশির এপিঠ দেখছি তখনও তিনি, যখন উল্টো পিঠ দেখছি তখনও তিনি।

উঃ, আমার কি অবস্থা গেছে! মন অখণ্ডে লয় হয়ে যেত এমন কতদিন। সব ভক্তি-ভক্ত ত্যাগ করলুম। জড় হলুম দেখলুম মাথাটা নিরাকার, প্রাণ যায় যায়। রামলালের খুড়ীকে ডাকাব মনে করলুম। ঘরে ছবিটবি যা ছিল সব সরিয়ে ফেলতে বললুম। আবার হুঁশ যখন আসে তখন প্রাণ যায় যায়। মন নেমে আসবার সময় প্রাণ আটুপাটু করতে থাকে। শেষে ভাবতে লাগলুম তবে কি নিয়ে থাকব? তখন ভক্তি-ভক্তের উপর মন এলো। তখন

লোকদের জিজ্ঞাসা করে বেড়াতে লাগলুম যে, এ আমার কি হল? ভোলানাথ (খাজাঞ্চী) বললে, ভারতে আছে।

যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটা থেকে শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে যায়, সেইখানে ছ'মাস ছিলুম। কখন কোনদিক দিয়ে যে দিন আসত, রাত যেত, তার ঠিকানাই হত না। মরা মানুষের নাকেমুখে যেমন মাছি ঢোকে—তেমনি ঢুকত, কিন্তু সাড় হত না। চুলগুলো ধূলোয় ধূলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল। হয়তো অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয় নাই। শরীরটা কি আর থাকত। এই সময়েই যেত। তবে এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল, আর বুঝেছিল—এ শরীরটা দিয়ে মার অনেক কাজ বাকী আছে, এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা করত। একটু হুঁশ হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোনোদিন একটু আধটু পেটে যেত, কোনোদিন যেত না। এইভাবে ছ'মাস গেছে। তারপর এই অবস্থার কতদিন পর শুনতে পেলুম মার কথা,—ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্।

৪॥ একসময় এমনটা মনে হল যে, সবরকম সাধকদের যা-কিছু জিনিষ সাধনার জন্য দরকার, সে সব তাদের যোগাব। তারা এইসব পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ঈশ্বর সাধনা করবে। তাই দেখবো আর আনন্দ করবো। সেজবাবুকে বললুম। সে বললে, তার আর কি বাবা, সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তোমার যাকে যা ইচ্ছা হবে দিও। ঠাকুরবাড়ির ভাণ্ডার থেকে চাল ডাল আটা—যার যেমন ইচ্ছা তাকে সেই রকম সিধা দেবার ব্যবস্থা তো ছিলই—তার উপর সেজবাবু সাধুদের দেবার জন্য লোটা, কমণ্ডলু, কম্বল, আসন, মায় তারা যেসব নেশা ভাঙ্ করে—সিদ্ধি, গাঁজা, তান্ত্রিক সাধুদের জন্য কারণ সব জিনিষের বন্দোবস্ত করে দিলে। তখন তান্ত্রিক সব ঢের আসত আর শ্রীচক্রের অনুষ্ঠান করত। আমি আবার তাদের সাধনায় দরকার বলে আদাপেঁয়াজ ছাড়িয়ে মুড়ি কড়াই ভাজা আনিয়ে সব যোগাড় করে দিতুম। আর তারা সব ঐ নিয়ে পুজো করছে, জগদম্বাকে ডাকছে, দেখতুম। আমায় তারা আবার অনেক সময় চক্রে নিয়ে বসতো, অনেক সময় চক্রেশ্বর করে বসাতো, কারণ নিতে অনুরোধ করত। কিন্তু যখন বুঝত ওসব নিতে পারি না, নাম করলেই নেশা হয়ে যায়, তখন আর অনুরোধ করত না। তাদের সঙ্গে বসলে কারণ নিয়ে ফোঁটা কাটতুম বা আঘ্রাণ নিতুম, বড়জোর আঙ্গুলে করে মুখে ছিটে দিতুম আর তাদের পাত্রে সব ঢেলে ঢেলে দিতুম। দেখতুম

কেউ কেউ তা নিয়ে ঈশ্বর-চিন্তায় মন দেয়, বেশ তন্ময় হয়ে তাঁকে ডাকে। অনেকে কিন্তু আবার লোভে পড়ে খায়, আর জগদম্বাকে ডাকা দূরে থাক বেশী খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে। একদিন ঐরকম বেশী ঢলাঢলি করাতে শেষটা ওসব দেওয়া বন্ধ করে দিলুম। রাজ-কুমারকে (অচলানন্দকে) কিন্তু বরাবর দেখেছি তা নিয়ে তন্ময় হয়ে জপে বসত, কখনো অন্যদিকে মন দিত না। শেষটা কিন্তু যেন একটু নাম-যশ-প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক হয়েছিল। হতেই পারে—ছেলেপিলে পরিবার ছিল—বাড়িতে অভাবের দরুণ টাকাকড়ি লাভের দিকে একটু-আধটু মন দিতে হত। তা যাই হোক্, সে কিন্তু বাপু, সাধনার সহায় বলেই কারণ নিত। লোভে পড়ে ঐসব খেয়ে কখনো ঢলাঢলি করে নি—ওটা দেখেছি।

মথুর যে চৌদ্দ বছর সেবা করেছিল সে কি অমনি করেছিল। মা তাকে এর ভিতর দিয়ে কতরকম অদ্ভুত সব দেখিয়েছেন, তাই সে অত সেবা করেছিল। জগদম্বা দাসীকে (মথুরবাবুর স্ত্রীকে) ভাল করে ছ'মাস ধরে পেটের অসুখে আর আর যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছিল। জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে ভাল হতে লাগল আর তার ঐ রোগটার ভোগ এই শরীরের উপর দিয়ে হতে থাকল।

আমার তখন খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি। মাথায় যেন দু'লাখ পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতাদন চলছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এলো। সে দেখে, আমি বসে বিচার করছি। তখন সে বললে, এ কি পাগল! দু'খানা হাড় নিয়ে বিচার করছে। যখন পেটের ব্যামোতে বড় ভুগছি, হৃদে বললে, মাকে একবার বল না, যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হল। বললুম, মা, সুসাইটিতে (Asiatic Society) মানুষের হাড় দেখেছিলুম, তার দিয়ে জুড়ে জুড়ে মানুষের আকৃতি;

মা, এ রকম করে শরীর একটু শক্ত করে দাও, তাহলে তোমার নাম গুণ-কীর্তন করব।

হৃদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল—অনেক সেবা করেছিল। হাতে করে গু পরিষ্কার করত। তেমনি শেষে শাস্তিও দিয়েছিল। এত শাস্তি দিত যে, পোস্তার উপর গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু আমার অনেক করেছিল। ছেলেকে যেমন মানুষ করে, সেইরকম করে আমাকে দেখেছে। আমি তো রাতদিন বেহুঁশ হয়ে থাকতুম, তার উপর আবার অনেকদিন ধরে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে-রকম করে আমায় রাখত, সেই রকম আমি থাকতুম।

হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাবো মতলব হল। ভাবলুম, কাপড় লব, কিন্তু টাকা কেমন করে লব? আর কাশী যাওয়া হল না।

গোবিন্দরায়ের কাছে আল্লামন্ত্র নিলুম, কুঠিতে প্যাঁজ দিয়ে রান্না ভাত হল। খানিক খেলুম। মণি মল্লিকের বাগানে ব্যন্নুন রান্না খেলুম, কিন্তু কেমন একটা ঘেন্না হল।

ঐ সময়ে আল্লামন্ত্র জপ করতুম, মুসলমানদের মত কাছা খুলে কাপড় পড়তুম, ত্রিসন্ধ্যা নামাজ পড়তুম। হিন্দুভাব মন থেকে একেবারেই লোপ পেয়েছিল। হিন্দু দেবদেবীদের প্রণাম তো দূরের কথা, দর্শন করতেও ইচ্ছা হত না। তিন দিন এভাবে কাটাবার পর ঐ মতের সাধনায় সম্পূর্ণ ফললাভ করেছিলুম।

সাত বছর উন্মাদের পর ওদেশে গেলুম। তখন কি অবস্থাই গেছে। খান্‌কি পর্যন্ত খাইয়ে দিলে। এখন কিন্তু পারি না। গাড়ি করে যাচ্ছি—বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলুম দুই বেশ্যা। দেখলুম সাক্ষাৎ ভগবতী—দেখে প্রণাম করলুম।

যখন আমি ওদেশে, রামলালের ভাই (শিবনাথ) তখন ৪/৫ বছর

বয়স—পুকুরের ধারে ফড়িং ধরতে যাচ্ছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শব্দ পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে—চোপ্। আমি ফড়িং ধরব। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, আমার সাথে ঘরের ভিতর সে আছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তবু দুয়ার খুলে খুলে বাইরে যেতে চায়। বকার পর আর গেল না। উঁকি মেরে মেরে এক একবার দেখছে বিদ্যুৎ আর বলছে—খুড়ো, আবার ছকমকী ঠুকছে। বালক সব চৈতন্যময় দেখছে।

আমি এক জায়গায় যেতে চেয়েছিলুম। রামলালের খুড়িকে (সারদাদেবীকে) জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে, আর যাওয়া হল না। খানিক পরে ভাবলুম, উঃ, আমি সংসার করি নাই, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী, তাতেই এই। সংসারীরা না জানি পরিবারের কাছে কি রকম বশ।

ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্তদিন আমার কাছে থাকত, চারপাঁচ বছরের ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা করত, একরকম ভুলে থাকত। যাই সন্ধ্যা হয়, অমনি বলে, মা যাব। আমি কত বলতুম, পায়রা দোব, এই সব কথা, সে ভুলত না। কেঁদে কেঁদে বলত, মা যাব। খেলাটেলা কিছুই ভাল লাগছে না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদতুম। এই বালকের মত ঈশ্বরের জন্য কান্না। এই ব্যাকুলতা। আর খেলা খাওয়া কিছুই ভাল লাগে না। ভোগান্তে এই ব্যাকুলতা ও তার জন্য কান্না।

তৃতীয় পর্ব | ১৮৬৮ - ১৮৭৪

তীর্থ দর্শন

১॥ তীর্থে গেলুম। তা এক একবার ভারি কষ্ট হত। কাশীতে সেজবাবুদের সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায় গিয়েছিলুম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে। টাকা জমি—'এত টাকা লোকসান্ হয়েছে'—এই সব কথা। কথা শুনে আমি কাঁদতে লাগলুম। বললুম, মা, কোথায় আনলি। দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির মন্দিরে যে আমি বেশ ছিলুম। তীর্থ করতে এসেও সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা। কিন্তু সেখানে তো বিষয়ের কথা শুনতে হয় নাই। পইরাগে (প্রয়াগে) দেখলুম, সেই পুকুর, সেই দূর্বা, সেই গাছ, সেই তেঁতুলপাতা।

তবে তীর্থে উদ্দীপন হয় বটে। সেজবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবন গেলুম। সেজবাবুর বাড়ির মেয়েরাও ছিল, হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্র উদ্দীপন হত। আমি বিহ্বল হয়ে যেতুম। হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে ছেলেটির মত নাওয়াত।

যমুনার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতুম। যমুনার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হতে গরু সব ফিরে আসত। দেখবামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হল। উন্মত্তের মত আমি দৌড়তে লাগলুম—'কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই'—এই বলতে বলতে। পালকী করে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ডের পথে যাচ্ছি, গোবর্দ্ধন দেখতে নামলুম। গোবর্দ্ধন দেখবামাত্র একেবারে বিহ্বল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্দ্ধনের উপর দাঁড়িয়ে পড়লুম। আর বাক্যশূন্য হয়ে গেলুম। তখন ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে

আনে। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পথে সেই মাঠ, আর গাছপালা, পাখী হরিণ—এইসব দেখে বিহ্বল হয়ে গেলুম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কৃষ্ণরে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না। পালকীর ভিতর বসে, কিন্তু একবার একটি কথা কইবার শক্তি নাই, চুপ করে বসে। হৃদে পালকীর পিছনে আসছিল। বেয়ারাদের বলে দিছল, খুব হুঁশিয়ার।

আমি বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলুম। পনের দিন রেখেছিলুম। সব ভাবই কিছুদিন কিছুদিন করতুম, তবে শান্তি হত। বৃন্দাবনের বেশ ভাবটি। নূতন যাত্রী গেলে ব্রজবালকেরা বলতে থাকে, 'হরি বোলো, গাঁঠরী খোলো'।

মথুরার ধ্রুবঘাট যেই দেখলুম, অমনি দপ্ করে দর্শন হল, বসুদেব কৃষ্ণ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। আবার সন্ধ্যার সময় যমুনা-পুলিনে বেড়াচ্ছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর। বড় কুলগাছ। গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলুম, হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তারপরই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে। যেই দেখা অমনি 'কোথায় কৃষ্ণ' বলে বেহুঁশ হয়ে গেলুম।

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড দর্শন করতে ইচ্ছা হয়েছিল। পালকী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ; লুচি, জিলিপী পালকীর ভিতরে দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কাঁদতে লাগলুম, 'কৃষ্ণরে তুই নাই, কিন্তু সেই সব স্থান রয়েছে। সেই মাঠ, তুমি গরু চরাতে'। হৃদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পিছনে আসছিল। আমি চক্ষের জলে ভাসতে লাগলুম। বিয়ারাদের দাঁড়াতে বলতে পারলুম না। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডতে গিয়ে দেখলুম, সাধুরা একটি একটি ঝুপড়ির মত করেছে; তার ভিতরে পিছন ফিরে সাধন-ভজন করছে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। দ্বাদশবন দেখবার উপযুক্ত।

বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিছলুম।

গোবিন্দজীকে দুইবার দেখতে চাইলুম না। মথুরায় গিয়ে রাখাল-কৃষ্ণকে স্বপন দেখেছিলুম। হৃদে ও সেজবাবুও দেখেছিল।

কাশীতে নানকপন্থী ছোকরাসাধু দেখেছিলুম। আমায় বলত প্রেমী সাধু। কাশীতে তাদের মঠ আছে। একদিন আমায় সেখানে নিমন্ত্রণ করে লয়ে গেল। মোহান্তকে দেখলুম, যেন একটি গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, উপায় কি? সে বললে, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি। পাঠ করছিল, পাঠ শেষ হলে বলতে লাগল:

> জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণুঃ বিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে।
> ...সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

সবশেষে বললে, শান্তিঃ শান্তিঃ প্রশান্তিঃ। একদিন গীতাপাঠ করলে। তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না। আমার দিকে চেয়ে পড়লে। সেজবাবু ছিল। সেজবাবুর দিকে পিছন ফিরে পড়তে লাগল। সেই নানকপন্থী সাধুটি বলেছিল, উপায় নারদীয় ভক্তি।

কাশীতে একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান করতে বললে। আমি বললুম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তখন তারা খেতে লাগল। আমি মনে করলুম, এইবার বুঝি জপধ্যান করবে। তা নয়, নৃত্য করতে আরম্ভ করলে। আমার ভয় হতে লাগল, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটি গঙ্গার ধারে হয়েছিল। স্বামীস্ত্রী যদি ভৈরব-ভৈরবী হয় তবে তাদের বড় মান। ভেবেছিলুম কাশীতে সবাই চব্বিশঘণ্টা শিবের ধ্যানে সমাধিতে আছে দেখতে পাবো। বৃন্দাবনে সবাই গোবিন্দকে নিয়ে ভাবে প্রেমে বিহ্বল হয়ে রয়েছে দেখবো। গিয়ে দেখি সবই বিপরীত।

কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন। আমি নৌকার ধারে এসে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। মাঝিরা হৃদেকে বলতে লাগল, ধর! ধর! পাছে

পড়ে যাই। যেন জগতের যত গম্ভীর নিয়ে সেই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলুম দূরে দাঁড়িয়ে, তারপর কাছে আসতে দেখলুম। তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন। ভাবে দেখলুম, সন্ন্যাসী হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। একটি ঠাকুরবাড়িতে ঢুকলুম—সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হল।

ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখলুম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীর আশ্রয় করে প্রকাশ হয়েছেন। তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা। শরীরের কোন হুঁশই নেই। রোদে বালি এমনি তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য—সেই বালির উপরেই সুখে শুয়ে আছেন। পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলুম। তখন কথা কন না—মৌনী। ইশারায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, ঈশ্বর এক, না অনেক? তাতে ইশারা করে বুঝিয়ে দিলেন, সমাধিস্থ হয়ে দেখ তো এক, নইলে যতক্ষণ আমি, তুমি, জীব, জগৎ ইত্যাদি নানা জ্ঞান রয়েছে ততক্ষণ অনেক। তাঁকে দেখিয়ে হৃদেকে বলেছিলুম, একেই ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা বলে।

গঙ্গামায়ী বড় যত্ন করত। নিধুবনের কাছে কুটীরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে বলত, ইনি সাক্ষাৎ রাধা, দেহধারণ করে এসেছেন। আমায় দুলালী বলে ডাকত। তাকে পেলে আমার খাওয়া-দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া, সব ভুল হয়ে যেত। হৃদে একএকদিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত। সেও খাবার জিনিষ তয়ের করে খাওয়াতো। গঙ্গামায়ীর ভাব হত। তার ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা হত। ভাবে একদিন হৃদের কাঁধে চড়েছিল।

গঙ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তার কাছে থাকবার কথা হল। সব ঠিকঠাক। আমি

সিদ্ধচালের ভাত খাব, গঙ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হবে, আমার বিছানা ওদিকে হবে। আর কলকাতায় যাব না, কৈবর্তের ভাত আর কতদিন খাব। সব ঠিকঠাক। হৃদে তখন বললে, না তুমি কলকাতায় চল। তোমার এত পেটের অসুখ—কে দেখবে। গঙ্গামায়ী বললে, কেন, আমি দেখব, আমি সেবা করব। হৃদে একহাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী একহাত ধরে টানে। আমার খুব থাকবার ইচ্ছা। এমন সময়ে মাকে মনে পড়ল। মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির ন'বতে। অমনি সব বদলে গেল। মা বুড়ো হয়েছেন। ভাবলুম, মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছে যাই। গিয়ে সেইখানে ঈশ্বরচিন্তা করব—নিশ্চিন্ত হয়ে। আর থাকা হল না। তখন বললুম, না, আমায় যেতে হবে

যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে। যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই। যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপন হয়ে তার সেই ভাব আরো বেড়ে যায়। আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে? অনেক সময় শোনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে বা অন্য কোথাও পালিয়ে গেছে। তারপর আবার শুনতে পাওয়া যায়, সে সেখানে চেষ্টা-বেষ্টা করে একটা চাকরী জুটিয়ে নিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখেছে আর টাকা পাঠিয়েছে। তীর্থে বাস করতে গিয়ে কত লোকে সেখানে আবার দোকান-পাট-ব্যবসা ফেঁদে বসে। সেজবাবুর সঙ্গে পশ্চিমে গিয়ে দেখি, এখানেও যা, সেখানেও তাই। এখানকার আমগাছ, তেঁতুলগাছ বাঁশগাছটি যেমন, সেখানকার সেগুলিও তেমনি। তাই দেখে হৃদুকে বলেছিলুম, ওরে হৃদু, এখানে আর তবে কি দেখতে এলুম রে। সেখানেও যা, এখানেও তাই। কেবল মাঠেঘাটে বিষ্ঠাগুলো দেখে মনে হয় এখানকার লোকের হজমশক্তিটা ওদেশের লোকের চেয়ে বেশি।

২॥ আমি সবরকম সাধনা করেছি। সাধনা তিনপ্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে বা তাঁর নামটি শুদ্ধ নিয়ে থাকে। আর কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। রাজসিক সাধনে নানাপ্রকার প্রক্রিয়া,—এতবার পুনশ্চারণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে, পঞ্চতপা করতে হবে, ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে ইত্যাদি। তামসিক সাধনে তমোগুণ আশ্রয় করে সাধন। জয়কালী, কি তুই দেখা দিবি নে।—এই গলায় ছুরি দেব যদি তুই দেখা না দিস্। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই, যেমন তন্ত্রের সাধন।

সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতুম প্রদীপের শিখা—যখন হাওয়া নেই—একটুও নড়ে না—তার আরোপ করতুম। সজনে তুলসী এক বোধ হত। ভেদবুদ্ধি দূর করে দিলেন। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান সান্‌কি করে ভাত নিয়ে সামনে এলো। সান্‌কি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক বই দুই নাই। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধরে রয়েছেন। তিনিই জীবজগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন।

আমার বালকস্বভাব। হৃদে বললে, মামা, মাকে কিছু শক্তির কথা বল,—অমনি মাকে বলতে চললুম। এমনি অবস্থায় রেখেছে

য়, যে ব্যক্তি কাছে থাকবে, তার কথা শুনতে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাকলে অন্ধকার দেখে—আমারও সেইরূপ হত। আমার বালকের মত অধৈর্য্য অবস্থা আজ ব'লে নয়। সেজবাবুকে হাত দেখাতুম, বলতুম, হ্যাঁ গা, আমার কি অসুখ করেছে?

দয়ানন্দ বলেছিল, অন্দরে এসো, কপাট বন্ধ করে। অন্দর-বাড়িতে যে সে যেতে পারে না। আমি দীপশিখাকে নিয়ে আরোপ করতুম। লালচে রংটাকে বলতুম স্থূল, তার ভিতরে সাদা-সাদা ভাগটাকে বলতুম সূক্ষ্ম, সব ভিতরে কাল খড়কের মত ভাগটাকে বলতুম, কারণশরীর।

হৃষীকেশ সাধু এসেছিল। সে বললে যে, সমাধি পাঁচপ্রকার—তা তোমার সবই হয় দেখছি। পিপীলিকাবৎ, মীনবৎ, কপিবৎ, পক্ষিবৎ, তির্যকবৎ। কখনও বায়ু উঠে পিঁপড়ের মত শিরশির করে। কখনও সমাধি অবস্থায় ভাবসমুদ্রের ভিতর আত্মা-মীন আনন্দে খেলা করে। কখনও পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু বানরের ন্যায় আমায় ঠেলে আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি। সেই বায়ু হঠাৎ বানরের মত লাফ দিয়ে সহস্রারে উঠে যায়। তাই তো তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। আবার কখনও পাখীর মত এ ডাল থেকে ও ডাল—মহাবায়ু উঠতে থাকে। যে-ডালে বসে সে স্থান আগুনের মত বোধহয়। হয়তো মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান থেকে হৃদয়, এইরূপ ক্রমে মাথায় ওঠে। কখনও বা মহাবায়ু তির্যক গতিতে চলে—সর্পের ন্যায় এঁকেবেঁকে। ঐরূপ চলে চলে শেষে মাথায় এলে সমাধি।

নারায়ণ শাস্ত্রীর খুব বৈরাগ্য হয়েছিল। অতবড় পণ্ডিত—স্ত্রী ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। নারায়ণ শাস্ত্রী শুধু পণ্ডিত নয়, সাধ্য-সাধনা করেছিল। পঁচিশ বছর একটানে পড়েছিল। সাত বছর ন্যায় পড়েছিল, তবুও 'হর হর' বলতে বলতে ভাব হত। জয়পুরের রাজা সভাপণ্ডিত করতে চেয়েছিল। তা সে-কাজ স্বীকার করলে না। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাকত। বশিষ্ঠাশ্রমে যাবার ভারি

ইচ্ছা—সেখানে তপস্যা করবে। যাবার কথা আমাকে প্রায় বলত। আমি তাকে সেখানে যেতে বারণ করলুম। তখন বলে, কোন্‌দিন মরে যাবো। সাধন-ভজন কবে করব—ডুবকি কব্‌ ফাট যায়েগা। অনেক জেদাজেদির পর আমি যেতে বললুম।

শুনতে পাই কেউ কেউ বলে, নারায়ণ শাস্ত্রী নাকি শরীর ত্যাগ করেছে, তপস্যা করবার সময় ভৈরব নাকি চড় মেরেছিল। আবার কেউ কেউ বলে, বেঁচে আছে—এই আমরা তাকে রেলে তুলে দিয়ে এলুম।

নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল, মাইকেল এসেছিল। মথুরবাবুর বড়ছেলে দ্বারিকবাবু সঙ্গে করে এনেছিল। ম্যাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদ্দমা হবার যোগাড় হয়েছিল। তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ করছিল। দপ্তরখানার সঙ্গে বড় ঘর। সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বললুম। সংস্কৃতে ভাল কথা কইতে পারলে না। ভুল হতে লাগল। তখন ভাষায় কথা হল। নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, তুমি নিজের ধর্ম কেন ছাড়লে? মাইকেল পেট দেখিয়ে বললে, পেটের জন্য ছাড়তে হয়েছে। নারায়ণ শাস্ত্রী বললে, যে পেটের জন্য ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব। তখন মাইকেল আমায় বললে, আপনি কিছু বলুন। আমি বললুম, কে জানে কেন আমার কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার মুখ কে যেন চেপে ধরেছে।

জয়নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিল। গিয়ে দেখলুম বেশ ভাবটি। ছেলেগুলো দেখলুম ব্যুট পায়ে দেওয়া, ইংরাজী-পড়া। অতবড় পণ্ডিত, কিন্তু অহংকার ছিল না। নিজের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে বলেছিল, আমি কাশীতে যাবো আর সেখানে দেহ রাখব। যা বললে, তাই শেষে করলে। আইনমাফিক কাশীতে গিয়ে বাস হোলো আর কাশীতেই দেহত্যাগ হোলো।

ইঁদেশের গৌরী—পণ্ডিতও ছিল, সাধকও ছিল। শক্তি সাধক,

মার ভাবে মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে যেত। মাঝে মাঝে বলত, 'হারে রে, নিরালম্ব লম্বোদরজননী কং যামি শরণম্'। তখন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেত। আমিও আবিষ্ট হয়ে যেতুম। আমার খাওয়া দেখে বলত, তুমি ভৈরবী নিয়ে সাধন করেছ? একজন কর্তাভজা নিরাকারের ব্যাখ্যা করলে—নিরাকার অর্থাৎ নীরের আকার। গৌরী তাই শুনে মহা রেগে গেল। প্রথম প্রথম একটু গোড়া শাক্ত ছিল। তুলসীপাতা দুটো কাঠি করে তুলতো—ছুঁতো না। তারপর বাড়ি গেল। বাড়ি থেকে ফিরে এসে আর অমন করে নাই। গৌরী বেশ সব ব্যাখ্যা করত। এ, ঐ ব্যাখ্যা করত। এ শিষ্য, ঐ তোমার ইষ্ট। আবার রাবণের দশ মুণ্ড বলত দশ ইন্দ্রিয়। তমোগুণে কুম্ভকর্ণ, রজোগুণে রাবণ, সত্ত্বগুণে বিভীষণ। তাই বিভীষণ রামকে লাভ করেছিল।

গৌরী বলেছিল, কালী গৌরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তিনি নররূপে শ্রীগৌরাঙ্গ। স্ত্রীকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজো করত। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটি রূপ।

সেজবাবুর সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম চৈতন্য যদি অবতারই হয় তো সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারবো। একটু প্রকাশ দেখবার জন্য এখানে ওখানে বড় গোঁসাই-এর বাড়ি, ছোট গোঁসাই-এর বাড়ি ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম—কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম। দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময়ে দেখতে পেলুম অদ্ভুত দর্শন। দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখনো দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশপথ দিয়ে ছুটে আসছে।

অমনি 'ঐ এলো রে, এলো রে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলো বলতে না বলতে তারা কাছে এসে এর ভিতর ঢুকে গেল, আর বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলুম। জলেই পড়তুম, হৃদে কাছে ছিল, ধরে ফেললে। এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে, বাস্তবিকই অবতার, ঈশ্বরীয় শক্তির বিকাশ।

অক্ষয় (ভাইপো) মোলো—তখন কিছু হল না। কেমন করে মানুষ মরে বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম, যেন খাপের ভিতর তরোয়ালখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে। তরোয়ালের কিছু হল না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হল, খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা নিংড়াচ্ছে; অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি করছে। ভাবলুম, মা, এখানে পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নাই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল। এখানেই যখন এ রকম হচ্ছে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়, তাই দেখাচ্ছিস বটে!

৩॥ যখন যেরূপ লোক আসবে আগে দেখিয়ে দিত। দেখালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম সেজবাবু, তারপর শম্ভু মল্লিক—তাকে আগে কখনও দেখি নাই। ভাবে দেখলুম, গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শম্ভুকে দেখলুম, তখন মনে পড়ল, একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি।

শম্ভু মল্লিক আমায় বলেছিল, ঢাল নাই তরোয়াল নাই, শান্তিরাম সিং। বলেছিল—যখন আমি তার বাড়িতে প্রায় যেতুম—তুমি এখানে এস, অবশ্য আমার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পাও তাই এস—ঐটুকু আনন্দ আছে। বাগবাজার থেকে হেঁটে নিজের বাগানে আসত। কেউ বলেছিল, অত রাস্তা কেন গাড়ি করে আস না, বিপদ হতে পারে। তখন শম্ভু মুখ লাল করে বলে উঠেছিল, কি, তার নাম করে বেরিয়েছি, আবার বিপদ! বিশ্বাসেতেই সব হয়। আমি বলতুম, অমুককে যদি দেখি, তবে বলি সত্য। অমুক খাজাঞ্চি যদি আমার সঙ্গে কথা কয়। তা যেটা মনে করতুম সেটাই মিলে যেত।

আমি মাঝে মাঝে কাপড় ফেলে আনন্দময় হয়ে বেড়াতুম। শম্ভু একদিন বলছে, ওহে, তুমি তাই ন্যাংটো হয়ে বেড়াও। বেশ আরাম। আমি একদিন দেখলুম। বলতো, হৃদু, পোঁটলা বেঁধে বসে আছি। আমি বলতুম, কি অলক্ষণে কথা কও। তখন শম্ভু

বলে, না, বলো, এসব ফেলে যেন তাঁর কাছে যাই। মুখ রাঙা করে বলেছিল, সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণীর কথা বলেছিল। বললে, এখন এই আশীর্বাদ করুন যেন যা টাকা আছে সেগুলো সদ্ব্যয়ে যায়—হাসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারি করা, রাস্তাঘাট করা, কূয়ো করা—এই সব। আমি বললুম, সম্মুখে যেটা পড়ল, না করলে নয়, সেইটাই নিষ্কাম হয়ে করতে হয়। এসব কর্ম অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়—ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। আর যাই হোক্, এটি যেন মনে থাকে যে তোমার মানবজন্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ, হাসপাতাল ডিস্‌পেন্‌সারি করা নয়। কালীঘাটে দানই করতে লাগল, কালীদর্শন আর হল না। আগে যো সো করে ধাক্কাধুক্কি খেয়েও কালীদর্শন করতে হয়। তারপর দান যত করো আর না করো। ইচ্ছা হয় খুব করো। ঈশ্বর লাভের জন্যই কর্ম।

শম্ভুকে তাই বললুম, মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন, এসে বললেন, তুমি বর লও। তাহলে তুমি কি বলবে, আমায় কতকগুলো হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি করে দাও? ভক্ত কখনো তা বলে না; বরং বলবে, হে ভগবান, তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমাকে আমি সর্বদা দেখতে পাই। হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি এসব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধহয়, তিনিই কর্তা, আমরা অকর্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি? তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারি হতে পারে। তাই বলছি, কর্ম আদিকাণ্ড।

শম্ভু বলেছিল, আর এখন এই আশীর্বাদ কর যাতে এই ঐশ্বর্য তার পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য। তাঁকে তুমি কি দেবে। তাঁর পক্ষে এগুলো কাঠ-মাটি।

নাক টেপা হওয়া ভাল নয়। শম্ভুর নাকটি টেপা ছিল। তাই অত জ্ঞান থেকেও তত সরল ছিল না।

চতুর্থ পর্ব | ১৮৭৫-১৮৮২
ভক্তসমাগম

১॥ কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখলুম (ভাবে)। কেশব সেন আর তার দল। একঘর লোক আমার সামনে বসে রয়েছে। কেশবকে দেখাচ্ছে, যেন একটি ময়ূর তার পাখা বিস্তার করে বসে রয়েছে। পাখা অর্থাৎ দলবল। কেশবের মাথায় দেখলুম লালমণি। ওটি রজোগুণের চিহ্ন। কেবল শিষ্যদের বলছে, ইনি কি বলছেন তোমরা সব শোনো। মাকে বললুম, মা, এদের ইংরাজী মত, এদের বলা কেন। তারপর মা বুঝিয়ে দিলে যে কলিতে এরকম হবে। তখন এখান থেকে হরিনাম আর মায়ের নাম ওরা নিয়ে গেল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে নিলে। কিন্তু আদি সমাজে গেল না।

কেশব সেনকে প্রথম দেখি আদি সমাজে। জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রের সমাজে গিয়ে দেখলুম, কেশব সেন বেদীতে বসে, ধ্যান করছে। তখন ছোকড়া বয়েস। তাকের উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলুম যেন কাষ্ঠবৎ। আমি সেজবাবুকে বললুম, যতগুলি ধ্যান করছে, এই ছোকরার ফাতনা ডুবেছে, বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে। ঐ ধ্যানটুকু ছিল বলে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুনো মনে করেছিল (মানটানগুলো) হয়ে গেল।

কেশবকে দেখতে যাবার আগে নারায়ণ শাস্ত্রীকে বললুম, তুমি একবার যাও, দেখে এসো কেমন লোক। সে দেখে এসে বললে,

লোকটা জপে সিদ্ধ। সে জ্যোতিষ জানত, বলল, কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে কথা কইলাম, সে ভাষায় কথা কইল। তখন আমি হৃদেকে সঙ্গে করে বেলঘরের বাগানে গিয়ে দেখলুম; দেখেই বলেছিলুম, এরই ল্যাজ খসেছে। সভাশুদ্ধ লোক হেসে উঠল। কেশব বললে, তোমরা হেসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি। আমি বললুম, যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, আড়ায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না। যেই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তখন জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, ততদিন সংসার-জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যার ল্যাজ খসলে, জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে।

আমি লালপেড়ে কাপড় পরে জয়গোপাল সেনের বাগানে গিছলুম। কেশব সেন সেখানে ছিল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বলল, আজ বড় যে রং, লালপেড়ের বাহার। আমি বললুম, কেশবের মন ভোলাতে হবে, তাই বাহার দিয়ে এসেছি।

কেশব সেন শম্ভু মল্লিকের সঙ্গে এসেছিল। আমি তাকে বললুম, গাছের পাতাটি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না। স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? সকলই ঈশ্বরাধীন।

আমাকে পরখ করবার জন্য তিনজন ব্রহ্মজ্ঞানী ঠাকুরবাড়িতে পাঠিয়েছিল। তার ভিতর প্রসন্নও ছিল। রাতদিন আমায় দেখবে, দেখে কেশবের কাছে খবর দেবে। আমার ঘরের ভিতর রাত্রে ছিল—কেবল 'দয়াময় দয়াময়' করতে লাগল। আর আমাকে বলে, তুমি কেশববাবুকে ধর, তাহলে তোমার ভাল হবে। আমি বললুম, আমি সাকার মানি, তবু দয়াময় দয়াময় করে। তখন আমার একটা অবস্থা হল। হয়ে বললুম, এখান থেকে যা। ঘরের মধ্যে কোনোমতে থাকতে দিলুম না। তারা বারান্দায় গিয়ে শুয়ে রইল।

কেশব সেনের বাড়ি গিয়ে আর এক ভাব হল। ওরা নিরাকার নিরাকার করে—তাই ভাবে বললুম, মা, এখানে আসিস্‌নি, এরা তোর রূপ-টুপ মানে না। কেশব সেন বলেছিল, মহাশয়, যদি কেউ বিষয়-আশয় ঠিকঠাক করে ঈশ্বরচিন্তা করে—তা পারে নাকি? তার তাতে কিছু দোষ হতে পারে কি? আমি বললুম, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকূয়ো, আত্মীয় কালসাপের মত বোধহয়। তখন টাকা জমাবো, বিষয় ঠিকঠাক করব—এসব হিসাব আসে না। ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু—ঈশ্বরকে ছেড়ে বিষয় চিন্তা। কেশব সেন বললে, ঈশ্বরদর্শন কেন হয় না? তা বললুম যে, লোকমান্য, বিদ্যা, এসব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুসী নিয়ে যতক্ষণ চোষে, ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুসী। খানিকক্ষণ পরে চুসী ফেলে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে। তুমিও মোড়লি করছ। মা ভাবছে, ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক্।

কেশব সেন, প্রতাপ, এরা সব বলেছিল, মহাশয়, আমাদের জনক রাজার মত। আমি বললুম, জনকরাজা অমনি মুখে বললেই হওয়া যায় না। জনকরাজা হেঁটমুণ্ড হয়ে আগে নির্জনে কত তপস্যা করেছিল। তোমরা কিছু কর, তবে তো জনকরাজা হবে। কেশব সেনকে আরও বলেছিলুম, নির্জনে না গেলে শক্ত রোগ সারবে কেমন করে। রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারী রোগী, সেই ঘরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। তা রোগ সারবে কেমন করে? দিনকতক ঠাঁইনাড়া হয়ে থাকতে হয়, যেখানে আচার-তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ঘরে এলে আর ভয় নেই। তখন জনকের মত নির্লিপ্ত হতে পারবে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় সাবধান হওয়া চাই। খুব নির্জনে থেকে সাধন করা চাই। কেশবের দলে একটি চারটে পাশকরা ছোকরা সবাই আমার সঙ্গে তর্ক করছে দেখে—কেবল হাসে। আর

বলে, এর সঙ্গে আবার তর্ক। কেশব সেনের ওখানে আর একবার তাকে দেখলুম—কিন্তু তেমন চেহারা নাই।

কেশব সেনের ওখানে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিছলুম, আমায় নিয়ে গিছল। কি একটা আনলে ক্রশ (cross), আবার জল ছড়াতে লাগল। বলে, শান্তিজল। একজন দেখি মাতাল সেজে মাতলামি করছে। লুচি ছক্কা আনলে। তা ধোবা কি নাপিত আনলে, জানি না। বেশ খেলুম। আর একদিন নিমাই সন্ন্যাস, কেশবের বাড়িতে দেখতে গিছলুম। যাত্রাটি কেশবের কতকগুলো খোসামুদে শিষ্য জুটে খারাপ করেছিল। একজন কেশবকে বললে, কলির চৈতন্য হচ্ছেন আপনি। কেশব আবার আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, তাহলে ইনি কি হলেন? আমি বললুম, আমি তোমাদের দাসের দাস, রেণুর রেণু। কেশবের লোকমান্য হবার ইচ্ছা ছিল।

দেখলুম, একজন ডেপুটি, ৮০০ টাকা মাইনে পায়। সকলে বললে, খুব পণ্ডিত। কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পারে এইজন্য ব্যাকুল। এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে তা শুনবে না। ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, বাবা, এটা কি? বাবা, ওটা কি? তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিব্যস্ত। কেবল বই পড়েছে মাত্র, কিন্তু ধারণা হয় নাই।

দয়ানন্দকে দেখতে গিছলুম। তখন ওধারে একটি বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সেদিন। তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্য ব্যস্ত হতে লাগল। খুব পণ্ডিত। বাঙ্‌লাভাষাকে বলত গৌরাঙ্গ ভাষা। দেবতা মানতো—কেশব মানতো না। তা বলতো, ঈশ্বর এত জিনিষ করেছেন, আর দেবতা করতে পারেন না। নিরাকারবাদী। কাপ্তেন 'রাম রাম' করছিল, তা বললে, তার চেয়ে 'সন্দেশ সন্দেশ' বল।

কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা হচ্ছিল। কেশব বললে, আরও বলুন। আমি বললুম, আর বললে দলটল থাকে না। তখন

কেশব বললে, তবে আর থাক্ মশাই। তবু কেশবকে বললুম, 'আমি' 'আমার' এটি অজ্ঞান। আমি কর্তা আর আমার এইসব স্ত্রীপুত্র, বিষয়, মানসম্ভ্রম, এভাব অজ্ঞান না হলে হয় না। তখন কেশব বললে, মহাশয়, 'আমি' ত্যাগ করলে যে আর কিছুই থাকে না। আমি বললুম, কেশব, তোমাকে সব 'আমি' ত্যাগ করতে বলছি না। তুমি 'কাঁচা আমি' ত্যাগ কর। 'আমি কর্তা' 'আমার স্ত্রীপুত্র' 'আমি গুরু'—এ সব অভিমান 'কাঁচা আমি'। এইটি ত্যাগ কর। এইটি ত্যাগ করে 'পাকা আমি' হয়ে থাকো। 'আমি তাঁর দাস' 'আমি ভক্ত' 'আমি অকর্তা, তিনি কর্তা'। 'আমি দলপতি, দল করেছি' 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি'—এ আমি কাঁচা আমি। মত প্রচার বড় কঠিন। ঈশ্বরের আজ্ঞা ব্যতিরেকে হয় না। তাঁর আদেশ চাই। যেমন শুকদেব ভাগবতকথা বলতে আদেশ পেয়েছিলেন। যদি ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার করে কেউ আদেশ পায়, সে যদি প্রচার করে, লোকশিক্ষা দেয়, দোষ নাই। তার 'আমি' 'কাঁচা আমি' নয়, 'পাকা আমি'। তুমি দল দল করছ। তোমার দল থেকে লোক ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে। কেশব বললে, মহাশয়, তিন বৎসর এদলে থেকে আবার ওদলে গেল। যাবার সময় আবার গালাগাল দিয়ে গেল। আমি বললুম, তুমি লক্ষণ দেখ না কেন? যাকে তাকে চেলা করলে কি হয়। আর বলেছিলুম, তুমি আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো বলে বোধহয়। বলতে গেলেই দুটো। কেশব কালী মেনেছিল।

আমি কেশবকে বলেছিলুম যে মানুষের ভিতর তিনি বেশি প্রকাশ। মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত থাকে, তাদের বলে ঘুটী। ঘুটীর ভিতর মাছ, কাঁকড়া জমে থাকে। মাছ, কাঁকড়া খুঁজতে গেলে এ ঘুটীর ভিতর খুঁজতে হয়। ঈশ্বরকে খুঁজতে হলে অবতারের ভিতর খুঁজতে হয়। ঐ চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতর জগৎমাতা প্রকাশ হন।

কেশব সেন খুব আসত। এখানে এসে অনেক বদলে গেল। ইদানীং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে। আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল। কেশবের আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই। কলুটোলার বাড়িতে দেখা হল, হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে-ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের বসালে। টেবিলে কি লিখছিল, অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বসল, তা আমাদের নমস্কার-টমস্কার করা নাই। আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বললুম, সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই। ওতে রজোগুণ বৃদ্ধি হয়। তারা এলেই আমি নমস্কার করতুম। তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলে। আর কেশবকে বললুম, তোমরা হরিনাম কর, কলিতে তাঁর নাম-গুণ-কীর্তন করতে হয়। তখন ওরা খোল-করতাল নিয়ে হরিনাম ধরলে।

কেশব একদিন এসে রাত পর্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ কেউ বললে, আজ থেকে যাবো। সব বটতলায় (পঞ্চবটীতে) বসে। কেশব বললে, না কাজ আছে, যেতে হবে। তখম আমি হেসে বললুম, আঁষ-চুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? একজন মেছুনী মালীর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। মাছ বিক্রী করে আসছে, চুপড়ি হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। অনেক রাত পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। বাড়ির গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বললে, কি গো, তুই ছটফট করছিস্ কেন? সে বললে, কে জানে বাবু, বুঝি এই ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না। আমার আঁষ-চুপড়িটা আনিয়ে দিতে পারো? তাহলে বোধ হয় ঘুম হতে পারে। শেষে আঁষ-চুপড়ি আনাতে জল ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোতে লাগল। গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো হো করে হাসতে লাগল।

একদিন কেশব শিষ্যদের নিয়ে এখানে এসেছিল। আমি

বললুম, তোমরা কি রকম লেকচার দাও আমি শুনবো। তা গঙ্গার ঘাটের চাদনীতে সভা হল, আর কেশব বলতে লাগল। বেশ বললে, আমার ভাব হয়ে গিছ্‌ল। তারপর ঘাটে এসে বসে অনেক কথাবার্তা হল। আমি কেশবকে বললুম, তুমি এগুনো এত বল কেন? হে ঈশ্বর, তুমি কি সুন্দর ফুল করিয়াছ, তুমি আকাশ করিয়াছ, তুমি তারা করিয়াছ, তুমি সমুদ্র করিয়াছ, এই সব? যারা নিজে ঐশ্বর্য ভালবাসে তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বর্ণনা করতে ভালবাসে। আবার বললুম, যিনিই ভগবান, তিনিই একরূপে ভক্ত। তিনিই একরূপে ভাগবত। তাই বেদ-পুরাণ-তন্ত্র এসব পূজা করতে হয়। ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা। বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। তাই ভক্তের পূজাতে ভগবানের পূজা হয়। কেশব আর তার দলের লোকগুলি এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে। পূর্ণিমা, চারিদিকে চাঁদের আলোক। গঙ্গাকূলে, সিঁড়ির চাতালে সকলে বসে আছে। আমি বললুম, বল, ব্রহ্মই শক্তি—শক্তিই ব্রহ্ম। তারা আবার একস্বুরে বললে, ব্রহ্মই শক্তি, শক্তিই ব্রহ্ম। তাদের বললুম, যাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাকেই আমি মা বলি। মা বড় মধুর নাম।···যখন বাক্য মনের অতীত, নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, তখন বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলেছে। যখন দেখি যে তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তখন তাকে শক্তি আদ্যাশক্তি এই সব বলি। যখন বললুম, বলো, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব, তখন কেশব বললে, মহাশয়, এখন অতদূর নয়, তাহলে লোকে গোঁড়া বলবে।

কেশব সেন পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকে বললুম, এসব হিসাবে তোমার কি দরকার? তারপর আবার বললুম, যতক্ষণ না ঈশ্বরলাভ হয় ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমারেরা হাঁড়ি সরা রৌদ্রে শুকুতে দেয়, ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয় তাহলে তৈরী লাল হাঁড়িগুলো ফেলে দেয়। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার নিয়ে কাদা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়।

কেশব এত পণ্ডিত, ইংরাজীতে লেকচার দিত, কত লোকে তাকে মানত। স্বয়ং কুইন্ ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে। সে কিন্তু এখানে যখন আসত, শুধু গায়ে। সাধু দর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসত। একেবারে অভিমানশূন্য। কি সরল ছিল! একদিন ওখানে (কালীবাড়ি) গিছল। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বলে, অতিথি-কাঙালদের কখন খাওয়ানো হবে?

একদিন লেকচার দিলে। বললে, হে ঈশ্বর, এই কর যেন আমরা ভক্তি নদীতে ডুব দিতে পারি আর ডুব দিয়ে যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে পড়ি। মেয়েরা সব চিকের ভিতরে ছিল। আমি কেশবকে বললুম, একেবারে সবাই ডুব দিলে কি হবে? তাহলে এদের—মেয়েদের দশা কি হবে? এক একবার আড়ায় উঠো, আবার ডুব দিও, আবার উঠো। কেশব আর সকলে হাসতে লাগল।

তাদের উপাসনা দেখলুম। অনেকক্ষণ ভগবানের ঐশ্বর্যের কথা বলার পর বললে, এবার আমরা তাঁর ধ্যান করি। ভাবলুম, কতক্ষণ না জানি ধ্যান করবে। ওমা, দুমিনিট চোখ বুজতে না বুজতেই হয়ে গেল। এরকম ধ্যান করে কি তাঁকে পাওয়া যায়? যখন তারা সব ধ্যান করছিল, তখন সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম —পরে কেশবকে বললুম, তোমাদের অনেকের ধ্যান দেখলুম, কি মনে হল জান? দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলায় কখনো কখনো হনুমানের পাল চুপ করে বসে থাকে। যেন কত ভাল, কিছু জানে না। আসলে তা নয়, তারা তখন বসে বসে ভাবছে, কোন্ গেরস্তের চালে লাউ-কুমড়োটা আছে, কার বাগানে কলা-বেগুন হয়েছে। খানিকক্ষণ পরেই উপ্ করে সেখানে গিয়ে পড়ে আর তা ছিঁড়ে লয়ে পেট ভরতি করে। অনেকের ধ্যান দেখলুম ঠিক সেইরকম। সকলে শুনে হাসতে লাগল।

আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেত আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও। কেশব না থাকলে আমি কলকাতা গেলে কার সঙ্গে কথা কব। তাই ডাব-চিনি মেনেছিলুম। কেশবের মৃত্যুর কথা শুনে বোধ হল যেন আমার একটা অঙ্গ পড়ে গেছে।

কেশব সেনের মা এসেছিল। তাদের বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলে। সে তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগল। দেখলুম শোকে কাতর হয় নাই। এখানে এসে একাদশী করলে। মালাটি নিয়ে জপ করলে। বেশ ভক্তি দেখলুম।

২ ॥ ওদেশে যখন হৃদের বাড়িতে (কামারপুকুরের নিকট, সিওড়ে) ছিলুম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গাঁয়ে ঢোকার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলুম গৌরাঙ্গ। এমনি আকর্ষণ—সাতদিন সাতরাত লোকের ভিড়। কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক, গাছে লোক।

নটবর গোস্বামীর বাড়িতে ছিলুম। সেখানে রাতদিন লোকের ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতির ঘরে সকালে গিয়ে বসতুম। সেখানে আবার দেখি খানিকপরে সব গিয়েছে। সব খোল-করতাল নিয়ে গেছে। আবার 'তাকুটী'-'তাকুটী' করছে। খাওয়া দাওয়া বেলা তিনটের সময় হত। রব উঠে গেল, সাতবার মরে

সাতবার বাঁচে, এমন লোক এসেছে। পাছে আমার সর্দিগর্মি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত। সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল-করতাল—তাকুটী তাকুটী। হৃদে বকলে আর বললে, আমরা কি কখনো কীর্তন শুনি নাই। সেখানকার গোঁসাইরা ঝগড়া করতে এসেছিল। মনে করেছিল, আমরা বুঝি তাদের পাওনা-গণ্ডা নিতে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড় কি একগাছা সুতাও লই নাই। কে বলেছিল, ব্রহ্মজ্ঞানী। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করলে, এর মালা-তিলক নাই কেন? তারাই একজন বললে, নারকেলের বেল্লো আপনা-আপনি খসে গেছে। 'নারকেলের বেল্লো'—ও কথাটি ওইখানে শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে যায়।

দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হত। তারা রাত্রে থাকত। যে বাড়িতে ছিলুম তার উঠানে রাত্রে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হৃদে প্রস্রাব করতে রাতে বাইরে যাচ্ছিল, তা বলে, এইখানেই করো।

আকর্ষণ কাকে বলে ওইখানেই বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্‌কি লেগে যায়।

এসব জায়গায় তাঁতিরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব—তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন? পাতা বিষ্ণু। ও আমরা ছুঁই না। কোন্ শিব? আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব মানি। কেউ বলছে, তোমরা বুঝিয়ে দাও না কোন্ হরি মানো। তাতে বলছে, না, আমরা আর কেন? এখান থেকেই হোক্। একদিকে তাঁত বোনে, আবার এইসব লম্বা লম্বা কথা।

ওদেশে (শ্যামবাজারে) নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে সমাধিস্থ হলুম। বোধহল আমার লিঙ্গশরীর (সূক্ষ্মদেহ) শ্রীকৃষ্ণের পায় পায় বেড়াচ্ছে। জোড়াসাঁকো হরিসভায় ঐরূপ কীর্তনের সময় সমাধি হয়ে বাহ্যশূন্য। সেদিন দেহত্যাগের সম্ভাবনা ছিল।

সিওড়ে রাখাল ভোজন করালুম। তাদের হাতে হাতে সব
নপান দিলুম। দেখলুম সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল। তাদের জলপান
কে আবার খেতে লাগলুম। হৃদে লোক খাইয়েছিল। তার মধ্যে
:নেকেই খারাপ লোক। আমি বললুম, দেখ হৃদে, ওদের যদি তুই
ওয়াস, তবে এই তোর বাড়ি থেকে চললুম।

রঘুবীরের নামে জমি ওদেশে রেজেষ্ট্রি করতে গিছলুম। আমায়
ই করতে বললে, আমি সই করলুম না। আমার জমি বলে তো
াধ নাই। কেশব সেনের গুরু বলে খুব আদর করেছিল। আম এনে
লে, তা বাড়ি নিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে
:ই।

যখন যেরূপ লোক আসবে আগে দেখিয়ে দিতো।

কাপ্তেন যেদিন আমায় প্রথম দেখলে সেদিন রাত্রে রয়ে গেল।
:লকাতায় কাপ্তেনের বাড়িতে গিছলুম, ফিরে আসতে অনেক রাত
য়েছিল। তার বাড়ি হয়ে রামের বাড়ি যাবো। তাই কাপ্তেনকে
ললুম, গাড়িভাড়া দাও। কাপ্তেন তার মাগকে বললে। সে মাগও
তমনি—ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া করতে লাগল। শেষে কাপ্তেন বললে যে
:রাই (রামেরা) দেবে। কাপ্তেন বলে, আমার স্ত্রী জ্ঞানী। ভূতে
াকে পায়, সে জানে না যে ভূতে পেয়েছে। সে বলে, বেশ আছি।

কাপ্তেনের বাপ খুব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফৌজে সুবাদারের
াজ করত। যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পূজা করত। একহাতে
শিবপূজা, একহাতে তরবার-বন্দুক। খানসামা শিব গড়ে গড়ে
দিচ্ছে। শিবপূজা না করে জল খাবে না। ছয় হাজার টাকা
াহিনা বছরে। ওদের বংশই ভক্ত।

কাপ্তেনের অনেক গুণ। রোজ নিত্যকর্ম, নিজে ঠাকুরপূজা—
নানের মন্ত্রই কত। কাপ্তেন খুব একজন কর্মী। পূজা, জপ, আরতি,

পাঠ, স্তব এসব নিত্যকর্ম করে। যখন পূজা করতে বসে ঠিক এক
ঋষির মত। এদিকে কর্পূরের আরতি। ছোট কাপড় খানি প
আরতি করে। একবার তিনবাতিওলা প্রদীপে আরতি করে-
তারপর আবার এক বাতিওলা প্রদীপে। সেসময় কথা কয় না
আমায় ইশারা করে আসনে বসতে বললে। এদিকে গান গাইতে
পারে না, কিন্তু পূজা করতে আসনে বসে সুন্দর স্তব-পাঠ করে
তখন আর একটি মানুষ। যেন তন্ময় হয়ে যায়। পূজা করে যখ
ওঠে, চোখের ভাব—ঠিক যেন বোলতা কামড়েছে। আর সর্বদ
গীতা-ভাগবত এসব পাঠ করে। আমি দুএকটা ইংরাজী কথ
কয়েছিলুম, তা রাগ করলে। বলে, ইংরাজী পড়া লোক ভ্রষ্টাচারী
তার মার কাছে নীচে বসে, মা আসনের উপর বসবে।

লোকটা ভারী আচারী। আমি কেশব সেনের কাছে যেতুম
তাই এখানে একমাস আসে নাই। বলে, কেশব সেন ভ্রষ্টাচার—
ইংরাজের সঙ্গে খায়, ভিন্ন জাতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, জাত নাই
আমি বললুম, আমার সে সবে দরকার কি? কেশব হরিনাম করে
দেখতে যাই, ঈশ্বরীয় কথা শুনতে যাই। আমি কুলটি খাই, কাঁটায়
আমার কি কাজ। তবু আমায় ছাড়ে না, বলে, তুমি কেশব সেনের
ওখানে কেন যাও। তখন আমি বললুম, একটু বিরক্ত হয়ে, আমি
হরিনাম শুনতে যাই—আর তুমি লাটসাহেবের বাড়িতে যাও কেমন
করে? তারা ম্লেচ্ছ, তাদের সঙ্গে থাকো কি করে? এইসব বলার
পর তবে একটু থামে।

আমার অবস্থা কাপ্তেন বললে, উড্ডীয়মান ভাব। জীবাত্মা
আর পরমাত্মা, জীবাত্মা যেন একটি পাখী আর পরমাত্মা আকাশ—
চিদাকাশ। কাপ্তেন বললে, তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে
যায়, তাই সমাধি। কাপ্তেন বাঙ্গালীদের নিন্দা করলে। বললে,
বাঙ্গালীরা নির্বোধ। কাছে মানিক রয়েছে, চিনলে না।

তবেকি জান, রাতদিন বিষয়কর্ম। মাগ ছেলে ঘিরে রয়েছে,

যখনই যাই দেখি। আবার লোকজন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। এক একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী। বিকারের ঘোর লেগেই আছে, এক একবার চটকা ভাঙ্গে, তখন 'জল খাবো জল খাবো' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। আবার জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়—কোনো হুঁশ থাকে না। আমি তাই ওকে বললুম, তুমি কর্মী। কাপ্তেন বললে, আজ্ঞা, আমার পূজা এই সব করতে আনন্দ হয়। জীবের কর্ম বই আর উপায় নাই। আমি বললুম, কিন্তু কর্ম কি চিরকাল করতে হবে? মৌমাছি ভন্‌ভন্ কতক্ষণ করে? যতক্ষণ না ফুলে বসে। মধুপানের সময় ভন্‌ভনানি চলে যায়। কাপ্তেন বললে, আপনার মত আমরা কি পূজা আর কর্ম ত্যাগ করতে পারি? তার কিন্তু কথার ঠিক নাই। কখনও বলে, এসব জড়, কখনও বলে, এসব চৈতন্য। আমি বলি, জড় আবার কি? সবই চৈতন্য।

কাপ্তেন সংসারী বটে, কিন্তু ভারী ভক্ত। বেদ-বেদান্ত শ্রীমদ্‌ভাগবত, গীতা, অধ্যাত্ম—এসব কণ্ঠস্থ। খুব ভক্তি। আমি বরাহনগরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তা আমায় ছাতা ধরে। ওর বাড়িতে লয়ে গিয়ে কত যত্ন। বাতাস করে—পা টিপে দেয়—আর নানা তরকারী করে খাওয়ায়। আমি একদিন ওর বাড়িতে পাইখানায় বেহুঁশ হয়ে গেছি। ও তো অত আচারী, পাইখানার ভিতর আমার কাছে গিয়ে পা ফাঁক করে বসিয়ে দেয়। অত আচারী, ঘৃণা করলে না। কাপ্তেনের পরিবার আমায় বললে যে সংসার ওর ভাল লাগে না। তাই মাঝে বলছিল, সংসার ছেড়ে দেবো। মাঝে মাঝে 'ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেবো' করত। আগে হঠযোগ করেছিল—তাই আমার সমাধি কি ভাবাবস্থা হলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। কাপ্তেনের পরিবার—তার আবার আলাদা ঠাকুর, গোপাল। এবার তত কৃপণ দেখলুম না। সেও গীতা-টীতা জানে। ওদের কি ভক্তি। আমি যেখানে খাব, সেখানেই আঁচাব। খড়কে কাটিটি পর্যন্ত।

পাঁঠার চচ্চড়ি করে। কাপ্তেন বলে, পনর দিন থাকে। কিন্তু তার পরিবার বললে, নাহি নাহি, সাতরোজ। কিন্তু বেশ লাগল। ব্যঞ্জন সব একটু একটু। আমি বেশী খাই বলে আজকাল আমায় বেশী দেয়। তারপর খাবার পর হয় কাপ্তেন, নয় তার পরিবার বাতাস করবে।

কাপ্তেনের সঙ্গে একটি ওদের দেশের মেয়ে এসেছিল। ভারী ভক্ত, বিবাহ হয় নাই। বেশ এস্‌রাজ বাজিয়ে গান করলে। গীতগোবিন্দ গান কণ্ঠস্থ। তার গান শুনতে দ্বারিকবাবুরা বসেছিল। আমি বললুম, এরা শুনতে চাচ্ছে, লোক ভাল। যখন গীতগোবিন্দ গান গাইলে তখন দ্বারিকবাবু রুমালে চক্ষের জল পুছতে লাগল। 'বিয়ে কর নাই কেন' জিজ্ঞাসা করাতে বললে, ঈশ্বরের দাসী, আবার কার দাসী হব? আর সব্বাই তাকে দেবী বলে খুব মানে—যেমন পুঁথিতে আছে।

কাপ্তেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি বললুম, পুরুষ আর প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, হে রাম, যত পুরুষ দেখতে পাও সব তোমার অংশ। আর যত স্ত্রী দেখতে পাও, সব সীতার অংশ। কাপ্তেন খুব খুশি। বললে, আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে। সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা। এই কথা এই বললে, আবার তারপরই ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ করলে। বলে, ওরা ইংরাজী পড়ে, যা তা খায়। ওরা তোমার কাছে সর্বদা যায়, সে ভাল নয়। ওতে তোমার খারাপ হতে পারে। আমি প্রথমে বললুম, যায় তা কি করি। তারপর জ্যান (প্রাণ) থেতলে দিলুম। বললুম, যে লোকের বিষয়বুদ্ধি আছে সে লোক থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়বুদ্ধি যদি না থাকে, সে ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর—অতি নিকটে। কাপ্তেন রাখালের কথায় বলে যে ও সকলের বাড়িতে খায়। বুঝি হাজরার কাছে শুনেছে। তখন বললুম, লোকে হাজার তপ-জপ করুক, যদি

বিষয়বুদ্ধি থাকে, তাহলে কিছুই হবে না। আর শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে সে ব্যক্তি ধন্য। তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা এত তপ-জপ করে, কিন্তু ওর মধ্যে দালালী করবে—এই চেষ্টায় থাকে। তখন কাপ্তেন বলে, হ্যাঁ, তা ও বাৎ ঠিক হ্যায়। তারপর আমি বললুম, এই তুমি বললে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা। আবার এখন এমন কথা বলছ। কাপ্তেন বললে, তাতো, কিন্তু তুমি সকলকে তো ভালবাস না। আমি বললুম, 'আপো নারায়ণ' সবই জল। কিন্তু কোনো জল খাওয়া যায়, কোনোটিতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শৌচ করা যায়। এই যে তোমার মাগ-মেয়ে বসে আছে, আমি দেখছি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী। কাপ্তেন তখন বলতে লাগল, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ঠিক হ্যায়। তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায়।

কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিছলুম। তাকে দেখে বললুম, তোমাকে রাজা-টাজা বলতে পারবো না, কেন না সেটা মিথ্যা কথা হবে। আমার সঙ্গে খানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখলুম, সাহেব-টাহেব আনাগোনা করতে লাগল। রজোগুণী লোক, নানাকাজ লয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠানো হল। সে বলে পাঠালে, আমার গলায় বেদনা হয়েছে।

৩॥ এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা-যাওয়া করত। সে বাইরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে গিছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যেই নামছি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। বোধহয় হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে,' কি ঠাকুর, বলি, আছ কেমন? তার গলার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বললুম, ওরে হৃদে, এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এইরকম কথা। হৃদে হাসতে লাগল।

হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর এনেছিল। একদিন দেখি সেটিকে বাগানে বেঁধে দিয়েছে ঘাস খাওয়াবার জন্য। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, হৃদে, ওটাকে রোজ ওখানে বেঁধে রাখিস্ কেন? হৃদে বললে, মামা, এঁড়েটিকে দেশে পাঠিয়ে দেব। বড় হলে লাঙ্গল টানবে। যাই একথা বলেছে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলুম। মনে হয়েছিল, কি মায়ার খেলা! কোথায় কামারপুকুর সিওড়, কোথায় কলকাতা। এই বাছুরটি যাবে, ওই পথ। সেখানে বড় হবে। তারপর কতদিন পরে লাঙ্গল টানবে—এরই নাম সংসার এরই নাম মায়া। অনেকক্ষণ পরে মূর্চ্ছা ভেঙ্গেছিল।

একদিন ঠাকুরবাড়িতে কতকগুলি শিখ সিপাহি এসেছিল। মা কালীর মন্দিরের সম্মুখে তাদের সঙ্গে দেখা হল। একজন বললে, ঈশ্বর দয়াময়। আমি বললুম, বটে, সত্য নাকি? কেমন করে

।নলে ? তারা বললে, কেন মহারাজ, ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, ত যত্ন করছেন। আমি বললুম, সে কি আশ্চর্য ? ঈশ্বর যে কলের বাপ। বাপ ছেলেকে দেখবে না তো কে দেখবে ? পাড়ার লোক এসে দেখবে নাকি ?

কি অবস্থাই গেছে। কুমার সিং সাধু ভোজন করাবে, আমায় মন্ত্রণ করলে। গিয়ে দেখলুম, অনেক সাধু এসেছে। আমি বসলে ার সাধুরা কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি গিরী, না পুরী ? যাই ক কথা জিজ্ঞাসা করা আমি আলাদা বসতে গেলুম। ভাবলুম, ত খবরে কাজ কি ? তারপর যেই সকলকে পাতা পেতে খেতে সালে, কেউ কিছু না বলতে বলতে আমি আগে খেতে লাগলুম। াধুরা কেউ কেউ বলতে লাগল, আরে, এ কেয়া রে।

একটি বেদান্তবাদী সাধু এখানে এসেছিল। মেঘ দেখে নাচত, ড়বৃষ্টিতে খুব আনন্দ। ধ্যানের সময় কেউ কাছে গেলে বড় চটে যত। আমি একদিন গিছলুম। যাওয়াতে ভারি বিরক্ত। সর্বদাই বচার করত, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, াই ঝাড়ের কলম লয়ে বেড়াত। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা ং দেখা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ কোনো রং নাই। তেমনি বস্তুতঃ ব্রহ্ম ব আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহংকারেতে, নানা বস্তু দেখাচ্ছে। াছে কোনো জিনিষে মায়া হয়, আসক্তি হয়, তাই কোনো জিনিষ একবার বৈ আর দেখবে না। স্নানের সময় পাখী উড়ছে দেখত। দেখে বিচার করত। দুজনে বাহ্যে যেতুম। মুসলমানের পুকুর শুনে আর জল নিলে না। হলধারী আবার ব্যাকরণ জিজ্ঞেস করলে, ব্যাকরণ জানে। ব্যঞ্জনবর্ণের কথা হল। তিনদিন এখানে ছিল। একদিন পোস্তার ধারে সানায়ের শব্দ শুনে বললে, যার ব্রহ্মদর্শন হয়, তার ওই শব্দ শুনে সমাধি হয়।

অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটি ছোকরা আসত, উমের কুড়ি বছর হবে। গোপাল সেন। যখন এখানে আসত তখন এত

ভাব হত যে হৃদয়কে ধরতে হত—পাছে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে যায়। সে ছোকরা একদিন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়ে বললে, আর আমি আসতে পারবো না। তবে আমি চললুম। কিছুদিন পরে শুনলুম, সে শরীর ত্যাগ করেছে।

সংসারী লোকদের একটা না একটা বাসনা থাকে। এদিকে ভক্তিও বেশ দেখা যায়। সেজবাবু কি একটা মোকদ্দমায় পড়েছিল—মা কালীর কাছে আমায় বলছে, বাবা, এই অর্ঘ্যটি মাকে দাও তো। আমি উদার মনে দিলুম। কিন্তু কেমন বিশ্বাস যে আমি দিলেই হবে।

ভোগলালসা থাকা ভাল নয়। আমি তাই জন্য যা যা মনে উঠত অমনি করে নিতুম। বড়বাজারের রং করা সন্দেশ দেখে খেতে ইচ্ছা হল। এরা আনিয়ে দিলে। খুব খেলুম—তারপর অসুখ। ছেলেবেলা গঙ্গা নাইবার সময়, তখন নাথের বাগানে, একটি ছেলের কোমরে সোনার গোট দেখেছিলুম। এই অবস্থার পর সেই গোট পরতে সাধ হল। তা বেশীক্ষণ রাখবার জো নাই—গোট পরে ভিতর দিয়ে শিরশির করে উপরে বায়ু উঠতে লাগল—সোনা গায়ে ঠেকেছে কিনা। একটু রেখেই খুলে ফেলতে হল। তা না হলে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

ধনেখালির খইচুর, খানাকুল কৃষ্ণনগরের সরভাজা, তাও খেতে সাধ হয়েছিল। শম্ভুর চণ্ডীর গান শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। সে গান শোনার পর আবার রাজনারায়ণের চণ্ডী শুনতে ইচ্ছা হয়েছিল। তাও শোনা হল। অনেক সাধুরা সে সময়ে আসত। তা সাধ হল তাদের সেবার জন্য আলাদা একটি ভাঁড়ার হয়। সেজবাবু তাই করে দিলে। সেই ভাঁড়ার থেকে সাধুদের সিধে, কাঠ এসব দেওয়া হত।

একবার মনে উঠল যে খুব ভাল সাঁচ্চা জরীর সাজ পরব। আঙটী আঙ্গুলে দেব। আর নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক

খাব। সেজবাবু নূতন সাজ গুড়গুড়ি সব পাঠিয়ে দিলে। সাজ পরা হল। বললুম, মন, এর নাম সাঁচ্চা জরীর পোষাক। গুড়গুড়ি নানারকম করে টানতে লাগলুম। একবার এপাশ থেকে, একবার ওপাশ থেকে—উঁচু থেকে নীচু থেকে। তখন বললুম, মন, এর নাম রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া। এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। সাজগুলো খানিক পরে খুলে ফেললুম—পা দিয়ে মাড়াতে লাগলুম—আর তার উপর থু থু করতে লাগলুম। বললুম, এর নাম সাজ, এরই নাম আঙটী। এই সাজে রজোগুণ হয়। সেই যে সব ফেলে দিলুম, আর মনে ওঠে নাই। পেঁয়াজ খেলুম আর বিচার করতে লাগলুম, মন, এর নাম পেঁয়াজ। তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক একবার ওদিক করে তারপর ফেলে দিলুম। আমার কামার বাড়ির দাল খেতে ইচ্ছা ছিল—ছেলেবেলা থেকে। কামাররা বলত, বামুনরা কি রাঁধতে জানে? তাই খেলুম, কিন্তু কামারে কামারে গন্ধ।

৪॥ আমি তিন ত্যাগ করেছিলুম—জমিন, জরু, টাকা। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নাই। ত্যাগ না হলে কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে? এখানে সিঁথির মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছল—রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন দিয়েছে? রামলাল বললে, এখানের

জন্য দিয়েছে। তখন মনে উঠতে লাগল যে দুধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লুম। একেবারে বুকের ভিতর বিল্লী আঁচড়াতে লাগল। তখন রামলালকে গিয়ে বললুম, কাকে দিয়েছে? তোর খুড়িকে কি দিয়েছে? রামলাল বললে, না, আপনার জন্য দিয়েছে। তখন বললুম, না, এক্ষণি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়। তা না হলে আমার শান্তি হবে না। রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসে তবে হয়।

এই অবস্থার পর আমার মাইনে সই করাতে ডেকেছিল—যেমন সবাই খাজাঞ্চির কাছে সই করে। আমি বললুম, তা আমি পারব না। আমি তো চাচ্ছি না। তোমাদের ইচ্ছা হয় আর কারুকে দাও। এক ঈশ্বরের দাস, আবার কার দাস হব? মল্লিক আমার খেতে বেলা হয় বলে রাঁধবার বামুন ঠিক করে দিছল। তখন লজ্জা হল। ডেকে পাঠালেই ছুটতে হত। আপনি যাই সে এক। একখানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে বলেছিল। আমি কালীঘর থেকে শুনলাম। সেজবাবু আর হৃদে একসঙ্গে পরামর্শ করছিল। আমি এসে সেজবাবুকে বললুম, ছাখো, অমন বুদ্ধি করো না। ওতে আমার ভারি হানি হবে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী, বেদান্তবাদী, এখানে আসতো। বিছানা ময়লা দেখে বললে, আমি দশ হাজার টাকা লিখে দেব, তার সুদে তোমার সেবা চলবে। যাই ওকথা বললে, অমনি মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিল। মাকে বললুম, মা, এতদিন পরে আবার লোভ দেখাতে এলি। যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলুম। চৈতন্য হবার পর তাকে বললুম, তুমি অমন কথা যদি আর মুখে বল, তাহলে এখানে আর এসো না। আমার টাকা ছোঁবার জো নাই। কাছেও রাখবার জো নাই। সে ভারি সূক্ষ্মবুদ্ধি, বললে, তাহলে এখনও আপনার ত্যাজ্য-গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই। আমি বললুম, আমার বাবু, এতদূর হয় নাই। লক্ষ্মীনারায়ণ

তখন হৃদয়ের কাছে দিতে চাইল। আমি বললুম, তাহলে আমায় বলতে হবে একে দে ওকে দে, না দিলে রাগ হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। সে সব হবে না। আরশির কাছে জিনিস থাকলে প্রতিবিম্ব হবে না?

সেই সময়ে ওর (সারদাদেবীর) মন বুঝবার জন্য ডাকিয়ে বললুম, ওগো, এই টাকা দিতে চাইছে, তুমি নাও না কেন—কি বল? শুনেই বললে, তা কেমন করে হবে? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ওটাকা তোমারই নেওয়া হবে। কারণ আমি রাখলে তোমার সেবায় বা অন্য দরকারে ব্যয় না করে থাকতে পারব না। ফলে তোমারই নেওয়া হবে। তোমায় লোকে শ্রদ্ধাভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য। তাই এটাকা কিছুতেই নেওয়া হবে না। ওর ঐকথা শুনে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।

দ্বারিকবাবু বনাত দিছল। আবার খোট্টারাও আনলে। নিলাম না। দেবার সেই ঈশ্বর। আর একটি অবস্থা আছে। কিছু সঞ্চয় করবার জো নাই। শম্ভু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলুম। তখন বড় পেটের অসুখ। শম্ভু বললে, একটু একটু আফিম খেও, তাহলে কম পড়বে। আমার কাপড়ের খোঁটে একটু আফিম বেঁধে দিলে। যখন ফিরে আসছি, ফটকের কাছে, কে জানে ঘুরতে লাগলুম— যেন পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর যখন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তখন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলুম। দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আসছি, আর চলতে পারলুম না, দাঁড়িয়ে পড়লুম। তারপর সেগুলো একটা ডোবের মত জায়গায় রাখতে হল—তবে আসতে পারলুম।

টাকা ছুঁলে হাত বেঁকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আর যদি আমি গিরো বাঁধি, যতক্ষণ না গিরো খোলা হয়, ততক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে। ধাতুর কোনো জিনিষে হাত দেবার জো নাই। একবার একটা বাটিতে হাত দিছলুম, তা হাতে শিঙ্গিমাছের কাঁটা

ফোটার মত হল। হাত ঝন্‌ঝন্‌ কন্‌কন্‌ করতে লাগল। গাড়ু না ছুঁলে নয়, তাই মনে করলুম, গামছাখানা ঢাকা দিয়ে দেখি, তুলতে পারি কিনা। যাই হাত দিয়েছি, অমনি হাতটা ঝন্‌ঝন্‌ কন্‌কন্‌ করতে লাগল। খুব বেদনা। শেষে মাকে প্রার্থনা করলুম, মা, আর অমন কর্ম করব না। মা, এবার মাপ করো।

আমার যে কি অবস্থা তা কেউ জানে না। মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট ঝন্‌ঝন্‌ করে। যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে। সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই। ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোনো মেয়ে এসে পড়ে, তাহলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে, আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে। কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার। আমারই ছয় মাস পরে বুক কেমন করে এসেছিল। তখন গাছতলায় পড়ে কাঁদতে লাগলুম। বললুম, মা, তা যদি হয়, তাহলে গলায় ছুরি দেব। মার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি কিনা, তাই মা হাত ধরে আছেন। একটুকু বেচালে পা পড়তে দেন না।

তখন তখন এমনি হত—বিষয়কথা যদি কেউ কয়েছে তো মনে হত মাথায় লাঠি মারলে। দূরে পঞ্চবটীতে পালিয়ে যেতুম, সেখানে ওসব কথা শুনতে পাবো না। বিষয়ী দেখলে ভয়ে লুকোতুম। আত্মীয়-স্বজনকে যেন কূপ বলে মনে হত। মনে হত তারা যেন টেনে কূপে ফেলবার চেষ্টা করছে। পড়ে যাবো, আর উঠতে পারবো না। দম বন্ধ হয়ে যেতো, মনে হত যেন প্রাণ বেরোয় বেরোয়—সেখান থেকে পালিয়ে এলে তবে শান্তি। ঐ অবস্থায় ঈশ্বরকথা বৈ আর কিছু ভাল লাগে না। বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনলে বসে বসে কাঁদতুম।

যে সমন্বয় করেছে সেই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু দেখি—সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তমত সবই সেই এককে লয়ে। যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানারূপ।

'নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাতহারি।
কাকে নিন্দো কাকে বন্দো দোনো পাল্লা ভারি॥'

ভক্তিযোগে সব পাওয়া যায়। আমি মার কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছিলুম, মা, যোগীরা যোগ করে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে আমায় জানিয়ে দাও—আমায় দেখিয়ে দাও। মা আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন। ব্যাকুল হয়ে তার কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন। বেদবেদান্ত পুরাণ তন্ত্র—এসব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।

খ্রীষ্টানদের বই একখানা একজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বললুম। তাতে কেবল পাপ আর পাপ। ব্রাহ্মসমাজেও কেবল পাপ। নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে গিছলুম। তাদের উপাসনার পর বেদীতে বসে লেকচার দিলে। লিখে এনেছে। পড়বার সময় আবার চারদিকে চায়। ধ্যান করছে, তা এক একবার আবার চায়। যে ঈশ্বর দর্শন করে নাই, তার উপদেশ ঠিক ঠিক হয় না। একটা কথা যদি ঠিক হল তো আর একটা গোলমেলে হয়ে যায়। এ লেকচারে কি হবে? এতে কি লোকশিক্ষা হয়? এক হরিসভায় আমায় নিয়ে গিছল। আচার্য হয়েছিলেন একজন পণ্ডিত, তাঁর নাম সামাধ্যায়ী। বলে কি—ঈশ্বর নীরস, আমাদের প্রেমভক্তি দিয়ে তাকে সরস করে নিতে হবে। এই কথা শুনে অবাক। যিনি রসস্বরূপ তাকেই কিনা বলছে নীরস। যেমন একজন বলেছিল, আমার মামার বাড়িতে এক গোয়াল ঘোড়া আছে।

দেখছি, বিচার করে একরকম জানা যায়, তাকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন দেখিয়ে দেন, সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন—এর নাম অবতার—তিনি যদি তাঁর মানুষীলীলা দেখিয়ে দেন, তাহলে আর বিচার করতে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না।

৫ ॥ আমার এই রকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই। নিত্যে পৌঁছানোর নাম ব্রহ্মজ্ঞান—বড় কঠিন। আবার যখন তিনি অবস্থা বদলে দেন, যখন লীলাতে মন নামিয়ে আনেন, তখন দেখি ঈশ্বর মায়া জীবজগৎ—তিনি সব হয়ে রয়েছেন। আবার কখনো তিনি দেখান, তিনি এই সমস্ত জীবজগৎ করেছেন—যেমন বাবু আর তার বাগান। তিনি কর্তা আর তারই এই সমস্ত জীবজগৎ। অনেকদিন হল বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে, তখন পূর্ণজ্ঞান হবে। এখন দেখছি তিনিই এক একরূপে বেড়াচ্ছেন। কখনও সাধুরূপে, কখনও ছলরূপে, কোথাও বা খলরূপে।

মাকে ডেকে কেঁদে কেঁদে বলতুম, মা, ভক্তদের জন্য আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে। সাধ ছিল, মাকে বলেছিলুম, মা, ভক্তের রাজা হব। আবার মনে উঠল, যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডাকবে, তার এখানে আসতেই হবে—আসতেই হবে। যখন আরতি হত, কুঠীর উপর থেকে চীৎকার করতুম, ওরে, কে কোথায় ভক্ত আছিস্ আয়। ঐহিক লোকদের সঙ্গে আমার প্রাণ যায়। তাদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন এমন করে উঠত, এমন-ভাবে মোচড় দিত যে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তুম। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হত। লোকের সামনে কি মনে করবে ভেবে কাঁদতে

পারতুম না। কোনো-রকমে সামলে-সুমলে থাকতুম। আর যখন দিন গিয়ে রাত আসত, মার ঘরে, বিষ্ণুঘরে আরতির বাজনা বেজে উঠত, তখন আরও একটা দিন গেল, কেউ এখনও এলো না ভেবে আর সামলাতে পারতুম না। কুঠীর উপরের ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয়রে' বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম আর ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। মনে হত পাগল হয়ে যাব। তারপর কিছুদিন বাদে সব একে একে আসতে সুরু করল। আর আগে (ভাবে) দেখেছিলুম বলে, তারা যেমন যেমন আসতে লাগল অমনি চিনতে পারলুম। তারপর পূর্ণ যখন এল, তখন মা বললে, ওই পূর্ণতে তুই যারা সব আসবে বলে দেখেছিলি তাদের আসা পূর্ণ হল। ঐ থাকের লোকের কেউ আসতে আর বাকী রইল না। মা দেখিয়ে বলে দিলে, এরাই সব তোর অন্তরঙ্গ।

আমি সঙ্গী খুঁজছি—আমার ভাবের লোক। খুব ভক্ত দেখলে মনে হয় এই বুঝি আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি সে আর এক রকম হয়ে যায়। সকলেই এক একটা ওজর করে।

হাজরা এখানে অনেক জপতপ করত। কিন্তু স্ত্রী, ছেলেপুলে, জমি এসব ছিল। কাজেকাজেই জপতপও করে, ভিতরে ভিতরে দালালিও করে। এ সব লোকের কথার ঠিক থাকে না। এই বলে মাছ খাব না, আবার খায়। টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকত—ডেকে লম্বা লম্বা কথা শোনাতো। আবার তাদের বলত, রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ ওরা জপতপ করতে পারে না—হো হো করে বেড়ায়। শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল, অদ্বৈতবংশ। ইচ্ছা এখানে একরাত্রি দুরাত্রি থাকে। আমি যত্ন করে তাকে থাকতে বললুম। হাজরা বলে কি, খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও। এ কথার মানে এই যে, দুধ-টুধ পাছে চায়, তাহলে হাজরার ভাগ থেকে কিছু দিতে হয়। আমি বললুম, তবে রে শালা, গোঁসাই বলে আমি ওঁর কাছে সাষ্টাঙ্গ হই, আর তুই সংসারে থেকে কামিনী-কাঞ্চন

লয়ে নানা কাণ্ড করে—এখন একটু জপ করে এত অহঙ্কার হয়েছে। লজ্জা করে না।

আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি বল কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে বললে, নরেন্দ্রের ষোলো আনা, আর আমার একটাকা দুই আনা। জিজ্ঞাসা করলুম, আমার কত হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মারছে, তোমার বারো আনা।

দক্ষিণেশ্বরে বসে জপ করত, আবার ওরই ভিতর থেকে দালালির চেষ্টা করত। বাড়িতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা শুধতে হবে। রাঁধুনী বামুনদের কথায় বলেছিল, ওসব লোকের সঙ্গে আমরা কি কথা কই। হাজরা আবার শিক্ষা দেয়, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত ভাবো। গাড়ি করে বলরামের বাড়ি যাচ্ছি, এমন সময় পথে মহাভাবনা হল। বললুম, মা, হাজরা বলে, নরেন্দ্র আর সব ছোকরাদের জন্য আমি অত ভাবি কেন। সে বলে, তুমি ঈশ্বরচিন্তা ছেড়ে এ সব ছোকরাদের চিন্তা করছ কেন। এই কথা বলতে বলতে একেবারে দেখালে যে, তিনিই মানুষ হয়েছেন। শুদ্ধ আধারে স্পষ্ট প্রকাশ হন। সেইরূপ দর্শন করে যখন সমাধি একটু ভাঙলো তখন হাজরার উপর রাগ করতে লাগলুম। বললুম, শালা আমার মন খারাপ করে দিছলো। আবার ভাবলুম, সে বেচারীরই বা দোষ কি? সে জানবে কেমন করে?

হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নেতি নেতি' করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। তাঁকে লাভ করবার পর অনুলোম বিলোম। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে তখন বোধ হয়, ঘোলেরই মাখম, মাখমেরই ঘোল। তখন ঠিক বোধহয় তিনিই সব হয়েছেন। কোনোখানে বেশি প্রকাশ, কোনোখানে কম প্রকাশ। মাঝে মাঝে ও আমায় শিক্ষা দেয়। তর্ক যখন করে, হয়তো আমি গালাগালি দিয়ে বসলুম। তর্কের পর মশারির ভিতর হয়তো শুয়েছি, আবার কি বলেছি মনে করে বেরিয়ে এসে

াজরাকে প্রণাম করে যাই, তবে হয়। হাজরা কোনোরকমে
িশ্বাস করবে না যে ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান্ অভেদ।
খন নিষ্ক্রিয়, তখন তাকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়
রেন তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু, অভেদ। অগ্নি বললে
াহিকাশক্তি অমনি বুঝায়, দাহিকাশক্তি বললে অগ্নিকে মনে
াড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার জো নাই।
খন প্রার্থনা করলুম, মা, হাজরা এখানকার মত পালটে দেবার চেষ্টা
রছে। হয় ওকে বুঝিয়ে দে, নয় এখান থেকে সরিয়ে দে।
ার পরদিন সে আবার এসে বললে, হাঁ, মানি। তখন বলে যে বিভু
ব জায়গায় আছেন। হাজরা একটি কম নয়। এখানে যদি বড়
রগা হয়, তবে হাজরা ছোট দরগা।

। ॥ নরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ—এরা সব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটী।
াদের শিক্ষা কেবল বাড়ার ভাগ। বটতলায় একটি ছেলে দেখে-
ছলুম। হৃদে বললে, তবে তোমার একটি ছেলে হবে। আমি বললুম,
ামার যে মাতৃযোনি। আমার ছেলে হবে কেমন করে? সেই
হলে রাখাল। কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলুম, ব্রজ-
গুলের ভিতরে রয়েছে।

আবার বলেছিলুম, মা, আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা
রে একটি শুদ্ধ ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ

একটি ছেলে আমায় দাও। তাই তো রাখাল হল। রাখাল আসবার কয়েকদিন আগে দেখলুম মা একটি ছেলেকে এনে হঠাৎ আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, এই তোর ছেলে। শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলুম। বললুম, সে কি! আমার আবার ছেলে কি? মা তাতে হেসে বুঝিয়ে দিলেন, সাধারণ সাংসারিকভাবের ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র। তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল এলো। তখন বুঝলুম এই সেই ছেলে।

তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল ঠিক যেন তিনচার বছরের ছেলে। আমায় ঠিক মায়ের মত দেখত। থেকে থেকে হঠাৎ দৌড়ে এসে কোলে বসে পড়ত আর বাড়ি তো দূরের কথা এখান থেকে কোথাও এক পা নড়তে চাইত না। তার বাপ পাছে এখানে না আসতে দেয়, সেজন্য কত বুঝিয়ে সুঝিয়ে এক একবার বাড়ি পাঠাতুম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু ভারি কৃপণ ছিল। প্রথম প্রথম নানাভাবে চেষ্টা করেছিল যাতে ছেলে এখানে আর না আসে। পরে যাই দেখলে এখানে ধনী বিদ্বান লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করত না। ছেলের জন্য কখনো কখনো এখানে এসেও হাজির হত। তখন রাখালের জন্য তাকে বিশেষ আদর-যত্ন করে সন্তুষ্ট করে দিছলুম।

শ্বশুর বাড়ির তরফ থেকে কিন্তু রাখালের এখানে আসা নিয়ে কখনও আপত্তি ওঠে নি। কারণ মনোমোহনের মা, স্ত্রী, বোন—সকলেরই এখানে আসা-যাওয়া ছিল। রাখাল আসার কিছুকাল পরে যেদিন মনোমোহনের মা রাখালের বালিকা-বধূকে নিয়ে এখানে এলো, সেদিন মনে হল বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না তো? ভেবে তাকে কাছে এনে পা থেকে মাথার চুল অবধি শরীরের গঠন তন্ন তন্ন করে দেখলুম। বুঝলুম ভয়ের কারণ নেই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মপথে কখনো বাধা হবে না। তখন সন্তুষ্ট হয়ে ন'বতে বলে পাঠালুম, টাকা দিয়ে যেন ছেলের বৌ-এর মুখ দেখে।

আমায় পেলে রাখালের মধ্যে যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হত তা বলে বুঝাবার নয়। তখন যে-ই তাকে অমন দেখত সে-ই অবাক হয়ে যেত। আমিও ভাবে তাকে ক্ষীর-ননী খাওয়াতুম, খেলা দিতুম। কত সময় কাঁধেও তুলেছি। তাতেও তার মনে একটু সঙ্কোচের ভাব আসত না। তখনি কিন্তু বলেছিলুম, বড় হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করলে এ ভাবটি আর থাকবে না। অন্যায় করলে তাকে শাসনও করতুম। একদিন কালীঘর থেকে প্রসাদী মাখম এসেছে, সে ক্ষিদে পেয়েছে বলে আপনি তা নিয়ে খেলে। তাতে বললুম, তুই তো ভারি লোভী, এখানে এসে কোথায় লোভত্যাগের চেষ্টা করবি, তা নয় আপনি মাখম নিয়ে খেলি। তখন সে ভয়ে জড়সড়। আর কখনো অমন করে নাই।

রাখালের মনে তখন বালকের মত হিংসাও ছিল। তাকে ছাড়া আর কাকেও আমি ভালবাসলে সইতে পারতো না। অভিমানে তার মন ভরে যেতো। তাতে কখনো কখনো তার জন্য আমার ভয় হত। ভাবতুম, মা যাদের এখানে নিয়ে আসছেন, তাদের উপর হিংসা করে পাছে তার অকল্যাণ হয়।

এখানে আসবার প্রায় তিনবছর পর রাখালের শরীর খারাপ হল বলে সে বলরামের সঙ্গে বৃন্দাবনে গিছল। এর কিছু আগে দেখেছিলুম, মা যেন তাকে এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তখন ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিলুম, মা, ও ছেলেমানুষ, বোঝে না, তাই কখনো কখনো অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান থেকে কিছুদিনের মত সরিয়ে দিতে হয়, তাহলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস্। অল্পকাল পরেই তার বৃন্দাবনে যাওয়া হয়। বৃন্দাবনে থাকবার সময়ে রাখালের অসুখ হয়েছে শুনে কত ভাবনা হয়েছিল তা বলতে পারি না। কারণ এর আগে মা দেখিয়েছিলেন, রাখাল সত্যি সত্যি ব্রজের রাখাল। যেখান থেকে যে এসে শরীর ধারণ করে সেখানে গেলে প্রায়ই তার পূর্ব্বকথা স্মরণ হয়ে শরীর ত্যাগ

হয়। এজন্য ভয় হয়েছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার কাছে কাতর হয়ে কত প্রার্থনা করি আর মা অভয় দিয়ে আশ্বস্ত করেন। ঐ রকম রাখাল সম্বন্ধে মা কত কি দেখিয়েছেন। তার অনেক কথা বলতে নিষেধ আছে।

রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা করে যে বাবার পাতে কি খাবো? আমি বলি, সে কি রে, তোর কি হয়েছে যে বাবার পাতে খাবি না।

এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল। তারপর একেবারে স্থির। দ্বিতীয় ভাব বলরামের বাড়িতে—ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল। রাখালের সাকার ঘর—নিরাকারের কথা শুনলে উঠে যাবে।

তার জন্য চণ্ডীকে মানলুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল, বাড়িঘর সব ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতুম—একটু ভোগের বাকি ছিল।

৭॥ নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো—ময়লা একখানা চাদর গায়ে, কিন্তু চোখমুখ দেখে বোধহল ভিতরে কিছু আছে। তখন বেশি গান জানত না, দু একটা গান গাইলে—'মন চল নিজ নিকেতনে' আর 'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে'। যখন আসত, একঘর

লোক, তবু ওর দিক পানে চেয়েই কথা কইতুম। ও বলত, এদের সঙ্গে কথা কন, তবে কইতুম। যদু মল্লিকের বাগানে কাঁদতুম, ওকে দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলুম। এখানে ভোলানাথের হাত ধরে কান্না। ভোলানাথ বললে, একটা কায়েতের ছেলের জন্য মশায় আপনার এরূপ করা উচিত নয়। মোটা বামুন একদিন হাত জোড় করে বললে, মশায়, ওর সামান্য পড়াশুনা, ওর জন্য আপনি এত অধীর কেন হন ?

ভবনাথ নরেনের জুড়ী—দুজনে যেন স্ত্রী পুরুষ। তাই ভবনাথকে নরেন্দ্রের কাছে বাসা করতে বললুম। ওরা দুজনেই অরূপের ঘর।

আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন। তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়া দেওয়া দুই থাক। একধারে কেদার চুনী, আর আর অনেক সাকার ভক্ত। বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল সুরকীর কাঁড়ির মত জ্যোতি। তার মধ্যে বসে নরেন্দ্র—সমাধিস্থ। ধ্যানস্থ দেখে বললুম, 'ও নরেন্দ্র!' একটু চোখ চাইলে। বুঝলুম ও একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। তখন বললুম, মা, ওকে মায়ায় বন্ধন কর। তা না হলে সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে।

নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম দেখা হল, দেখলুম, দেহবুদ্ধি নাই। বুকে হাত দিতেই বেহুঁশ হয়ে গেল। হুঁশ হলে কেঁদে বলতে লাগল, ওগো, তুমি আমার কি করলে। আমার যে মা-বাবা আছে। যদু মল্লিকের বাড়িতেও ঠিক ঐরকম হয়েছিল। ক্রমে তাকে দেখবার জন্য ব্যাকুলতা বাড়তে লাগল, প্রাণ আটু-পাটু করতে লাগল। তখন ভোলানাথকে বললুম, হ্যাঁ গা, আমার মন এমন হচ্ছে কেন ? নরেন্দ্র বলে একটি কায়েতের ছেলে, তার জন্য আমার এমন হচ্ছে কেন ? তখন ভোলানাথ বললে, এর মানে ভারতে আছে। সমাধিস্থ লোকের মন যখন নীচে আসে, তখন সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে। সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়। এই কথা শুনে

তবে আমার মনের শান্তি হল। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখব বলে বসে বসে কাঁদতুম।

পশ্চিমের দরজা দিয়ে নরেন্দ্র প্রথমদিন এ ঘরে ঢুকেছিল। দেখলুম, নিজের শরীরের দিকে নজর নাই, মাথার চুলের, পোষাকের কোনো পরিপাটি নাই, বাইরের কোনো জিনিষেই সাধারণ লোকের মত একটা আঁট নাই। সবই যেন আল্‌গা। চোখ দেখে মনে হল মনের অনেকটা ভিতরের দিকে কে যেন জোর করে টেনে রেখেছে। ভাবলুম, বিষয়ী লোকের আবাস কলকাতায় এমন সত্ত্বগুণী আধার, এ যে অসম্ভব। মেঝেতে মাদুর পাতা ছিল, বসতে বললুম। যেখানে গঙ্গাজলের জালা রয়েছে তার কাছেই বসল। তার সঙ্গে সেদিন দুচারজন আলাপী ছোকরাও এসেছিল। বুঝলুম তাদের স্বভাব একেবারেই আলাদা, সাধারণ বিষয়ী লোকের যেমন হয়। ভোগের দিকেই দৃষ্টি। গান গাইবার কথা জিজ্ঞাসা করে জানলুম, বাংলা গান দুচারটি মাত্র তখন শিখেছে। তাই গাইতে বললুম। তাতে সে ব্রাহ্মসমাজের 'মন চল নিজ নিকেতনে' গানটি ধরল আর ষোল-আনা মনপ্রাণ ঢেলে যেন ধ্যানস্থ হয়ে গাইতে লাগল। শুনে আর সামলাতে পারলুম না, ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লুম।

পরে সে চ'লে গেলে তাকে দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হয়ে রইল যে বলবার নয়। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হত যে মনে হত বুকের ভিতরটায় যেন কে গামছা নিংড়াচ্ছে। তখন আর সামলাতে পারতুম না। বাগানের উত্তর দিকে ঝাউতলায়, যেখানে কেউ বড় একটা যায় না, সেখানে গিয়ে 'ওরে তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না' বলে ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। খানিকটা অমনি কেঁদে তবে নিজেকে সামলাতে পারতুম। ক্রমান্বয়ে ছ'মাস অমনি হয়েছিল। আর সব ছেলেরা যারা এখানে এসেছে, তাদের কারু কারু জন্য কখনও কখনও মন কেমন করেছে, কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হয়েছিল তার তুলনায় সে কিছুই নয়।

যত্নু মল্লিকের বাড়িতে বাহ্যজ্ঞান লোপ হলে নরেন্দ্রকে সেদিন নানা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। কে সে, কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, কতদিন এখানে থাকবে—এই সব। সেও ওই অবস্থায় নিজের অন্তরে প্রবেশ করে ওই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছিল। তার বিষয়ে যা যা দেখেছিলুম—ভেবেছিলুম, তা সবই এ সময়ের উত্তরে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। সবকথা বলতে নিষেধ আছে। তবে এ কথা জেনেছিলুম যে নরেন্দ্র যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন আর দেহ থাকবে না। নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ।

নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর—নিরাকারের ঘর। পুরুষের সত্ত্বা। এত ভক্ত আসছে—ওর মত একটিও নেই। এক একবার বসে খতাই। তা দেখি, অন্য পদ্ম কারু দশদল, কারু ষোড়শদল, কারু শতদল, কিন্তু পদ্ম মধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। অন্যেরা কলসী ঘটি এসব হতে পারে, নরেন্দ্র জালা। ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী, যেমন হালদার-পুকুর। মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা-চক্ষু বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ—পোনা, কাঠি, বাটা—এই সব। খুব আধার—অনেক জিনিষ ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ। নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্দ্রিয়সুখের বশ নয়। পুরুষ পায়রা। নরেন্দ্র সভায় থাকলে আমার বল। নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর দেখতে পেলুম না। যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখা-পড়ায়, তেমনি বলতে কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাতভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। আমার নরেন্দ্রের ভিতর এতটুকু মেকি নাই, বাজিয়ে দেখ—টংটং করছে। আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ কান টিপে কোনও রকমে দু'তিনটে পাশ করেছে, বস, এই পর্যন্ত—ঐ করতেই যেন তাদের সব দম বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্রের কিন্তু তা নয়, হেসে খেলে সব কাজ করে। পাশ করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়। সে ব্রাহ্ম সমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সব ব্রাহ্মের মত নয়। সে যথার্থ

ব্রহ্মজ্ঞানী। ধ্যান করতে বসে তার জ্যোতিদর্শন হয়। সাধে নরেন্দ্রকে
এত ভালবাসি।

নরেন্দ্রকে যখন দেখি কখনো জিজ্ঞাসা করি নাই, তোর বাপের নাম কি ? তোর বাপের কখানা বাড়ি ? দেখলুম কেশব যেরূপ একটা শক্তির জোরে জগৎবিখ্যাত হয়েছে, নরেন্দ্রের ভিতর ঐরূপ আধারটা শক্তি পূর্ণভাবে রয়েছে। আবার দেখলুম কেশব আর বিজয়ের অন্তর দীপের শিখার মত জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল রয়েছে, পরে নরেন্দ্রের দিকে চেয়ে দেখি তার ভিতরে জ্ঞান-সূর্য উদিত হয়েছে—মায়ামোহের ছায়া পর্যন্ত সেখান থেকে দূর হয়ে গেছে। একাধারে নরেন্দ্রের কত গুণ। গাইতে-বাজাতে লেখা-পড়ায়। সেদিন কাপ্তেনের গাড়িতে এখান থেকে যাচ্ছিল, কাপ্তেন অনেক করে বললে তার কাছে বসতে। নরেন্দ্র ওধারে গিয়ে বসল, কাপ্তেনের দিকে ফিরে চেয়েও দেখলে না।

যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বলল, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক হয়ে ওকে বললুম, কথা কয় যে রে' নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলুম বললুম, মা, একি হল ! এসব কি মিছে ! নরেন্দ্র এমন কথা বললে তখন দেখিয়ে দিলে, চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য—চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, এসব কথা মেলে কেমন করে যদি মিথ্যা হবে। তখন বলেছিলুম, শ্যালা, তুই আমার অবিশ্বাস করিয়ে দিছলি। তুই আর আসিস্ নাই।

মা কালীকে আগে যা ইচ্ছে তাই বলত। আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলুম, তুই আর এখানে আসিস্ নাই। তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে। যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও রাগ করবে না।

আমি একদিন বলেছিলুম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ জলও খায়। তখন মাকে

বললুম, মা, এসব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল? ভারি ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের মধ্যে কতকগুলি পাখী উড়ছিল দেখে বলে উঠল—ঐ ঐ। আমি বললুম, কি? ও বললে—ওই চাতক, ঐ চাতক। দেখি কতকগুলো চাম্‌চিকে। সেই থেকে ওর কথা আর লই না। নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ, ঈশ্বর রসের সাগর। তোর ইচ্ছা হয় নাকি যে এই রসের সাগরে ডুব দেই। আচ্ছা মনে কর এক খুলি রস আছে, তুই মাছি হয়েছিস্‌। তা কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আমি খুলির কিনারায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাবো। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? সে বললে, বেশি দূরে গেলে ডুবে যাবো আর প্রাণ হারাবো। তখন আমি বললুম, বাবা, সচ্চিদানন্দ সাগরে সে ভয় নেই। এ যে অমৃতের সাগর, ঐ সাগরে ডুব দিলে মৃত্যু হয় না, মানুষ অমর হয়। ঈশ্বরেতে পাগল হলে মানুষ বেহেড হয় না।

নরেন্দ্র কাকেও কেয়ার করে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না। আবার যা জানে তাও বলে না। পাছে আমি লোকের কাছে বলে বেড়াই যে নরেন্দ্র এত বিদ্বান্‌। মায়ামোহ নাই। যেন কোনো বন্ধন নাই। খুব ভাল আধার। এদিকে জিতেন্দ্রিয়—বলেছে বিয়ে করবে না। নরেন্দ্র বেশি আসে না। সে ভাল। বেশি এলে আমি বিহ্বল হই। আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি। আর আমি ওর অনুগত।

হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বলেছিল, ঈশ্বর অনন্ত, তার ঐশ্বর্য অনন্ত। তিনি কি আর সন্দেশ-কলা খাবেন? না গান শুনবেন? ওসব মনের ভুল। নরেন্দ্র অমনি দশহাত নেমে গেল। তখন হাজরাকে বললুম, তুমি কি পাজি। ওদের অমন কথা বললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভক্তি গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে? তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, তবুও তিনি ভক্তাধীন।

একদিন দেখছি—মন সমাধিতে জ্যোতির্ময় পথে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। চন্দ্র সূর্য তারা—এসব ছাড়িয়ে মন প্রথমে সহজেই সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবেশ করল। তারপর সে রাজ্যে মন যতই উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে লাগল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবে-গড়া মূর্তি পথের দুপাশে রয়েছে দেখতে পেলুম। ক্রমে সে রাজ্যের একেবারে শেষ সীমায় মন এসে হাজির হল। সেখানে দেখলুম যেন এক জ্যোতির বেড়া খণ্ড আর অখণ্ডের জগতকে আলাদা করে রেখেছে। সেই বেড়া ডিঙিয়ে মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে গিয়ে ঢুকল। দেখলুম, সেখানে সাকার কোনো কিছুই নাই, দিব্যদেহী দেবদেবীরা পর্যন্ত এখানে আসতে যেন ভীত। তাই অনেক দূরে নীচে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করে রয়েছে। কিন্তু একটু পরেই দেখতে পেলুম জ্যোতির্ময় দেহধারী সাতজন প্রবীন ঋষি সেখানে সমাধি-অবস্থায় বসে আছেন। বুঝলুম, জ্ঞানে-পুণ্যে, ত্যাগে-প্রেমে এঁরা মানুষ তো দূরের কথা দেবদেবীদের অবধি ছাড়িয়ে গেছেন। অবাক হয়ে এঁদের মহত্ত্বের কথা চিন্তা করছি, এমনি সময়ে দেখি, চোখের সামনে অখণ্ডের ঘরের জ্যোতি-র্মণ্ডলের খানিকটা অংশ ঘন হয়ে এক দেবশিশুব আকার ধারণ করল। ওই দেব-শিশু ঋষিদের মধ্যে একজনার কাছে নেমে এসে নিজের কোমল হাতদুটি দিয়ে তাঁর গলা ভালবেসে জড়িয়ে ধরল পরে অতি মধুর কথায় আদর করে তাঁকে সমাধি থেকে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। সেই কোমল হাতের ছোঁয়ায় ঋষি সমাধি থেকে জেগে উঠলেন। তারপর ঢুলুঢুলু চোখে একদৃষ্টে সেই আশ্চর্য শিশুকে দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখে আনন্দের ভাব দেখে মনে হল শিশু যেন তাঁর বহুকালের চেনা প্রাণের জিনিষ। অদ্ভুত দেব-শিশু তখন খুব আনন্দ করে তাঁকে বলতে লাগল, 'আমি যাচ্ছি, তোমায় আমার সঙ্গে যেতে হবে।' ঋষি তার অনুরোধে কোনো কথা না বললেও চোখের ভাব থেকেই তার মনের ইচ্ছা বোঝা গেল। পরে অমনি প্রেমদৃষ্টিতে শিশুকে দেখতে দেখতে আবার সমাধিস্থ

হয়ে পড়লেন। তখন অবাক হয়ে দেখি তাঁরই শরীর মনের এক অংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকার নিয়ে বিলোম পথে পৃথিবীতে নেমে আসছে। নরেন্দ্রকে দেখেই বুঝেছিলুম, এ সেই ঋষি।

তিনি মানুষ হয়েও লীলা করছেন। আমি দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ। কাঠ ঘষতে ঘষতে যেমন আগুন বেরোয়, ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয়। পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার। নরেন্দ্রের পরেই ঐ বিষয়ে পূর্ণের স্থান বলা যেতে পারে। এখানে এসে ধর্মলাভ করবে বলে যাদের অনেক আগে ভাবে দেখেছিলুম, পূর্ণের আগমনে সেই থাকের ভক্তদের আসা পূর্ণ হল। এরূপ আর কেউ এখানে আসবে না।

৮ ॥ আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান। আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত—এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলুম, সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলে আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। দেখলুম এক চৈতন্য—অভেদ। প্রথমে দেখালে, অনেক মানুষ জীবজন্তু রয়েছে। তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরাজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদ্দফরাস, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান—হাতে এক শান্‌কি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই শান্‌কির ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু একটু দিয়ে গেল। আমি একটু আস্বাদ করলুম। আর একদিন দেখালে, বিষ্ঠা, মূত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন, সবরকম খাবার জিনিষ—

সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের শিখার মত সব আস্বাদ করলে। যেন জিহ্বা লক্ লক্ করতে করতে সব জিনিষ একবার আস্বাদ করলে। বিষ্ঠা মূত্র সব আস্বাদ করলে। দেখালে যে সব এক—অভেদ।

ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করলে আমার একটি অবস্থা হয়। তখন পরণের কাপড় পড়ে যায়, শিরশির করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি একটা ওঠে। তখন সকলকে তৃণজ্ঞান হয়। পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তাহলে তাকে খড়কুটো মনে হয়।

দেখলুম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।

বিদ্যাসাগর বলেছিল, মহাশয়, তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি বললুম, বিভুরূপে তিনি সকলের ভিতরে আছেন—আমার ভিতরে যেমনি, পিঁপড়েটির ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হবে তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে, তাই দেখতে এসেছি? তা নয়, তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এই সব গুণ তোমার অপরের চেয়ে বেশি আছে, তাই তোমার এত নাম। দেখ না এমন লোক আছে যে একলা একশো লোককে হারাতে পারে। আবার এমন আছে একজনের ভয়ে পালায়। যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এত মানতো কেন। গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যার জন্যেই হোক্ বা গাওনা-বাজনার জন্যেই হোক্ বা লেকচার দেবার জন্যেই হোক্ বা আর কিছুর জন্যেই হোক্—নিশ্চিত জেনো যে তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।

বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু এমন কাঁচা কথা বলে ফেললে—তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? কি জানো, জালে প্রথমে বড় বড় মাছ পড়ে, রুই কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো পুঁটি পাঁকাল এই সব মাছ বেরোয়—একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?

বিদ্যাসাগরকে বলেছিলুম, ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্ম কি—কেউ মুখে বলতে পারে নাই, তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই। বিদ্যাসাগর শুনে ভারি খুশি।

আমি তো মুখ্যু, কিছুই জানি না, তবে এসব কথা বলার কে? আবার এ জ্ঞানের ভাণ্ডার অক্ষয়। এ দেশে ধান মাপে 'রামে রাম' বলতে বলতে। একজন মাপে আর যাই ফুরিয়ে আসে আর একজন রাশ ঠেলে দেয়। তার কর্মই ওই, ফুরালেই রাশ ঠেলে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে-আসে হয়, মা আমার অমনি তাঁর অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দেন।

বঙ্কিম একজন পণ্ডিত। বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, আহার নিদ্রা মৈথুন। এই সকল কথাবার্তা শুনে আমার ঘৃণা হল। বললুম যে তোমার এ কি রকম কথা। তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া। যা সব রাতদিন চিন্তা করছ তাই আবার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। মুলো খেলেই মুলোর ঢেঁকুর ওঠে। তারপর অনেক ঈশ্বরীয় কথা হল। ঘরে সংকীর্তন হল। আমি আবার নাচলুম। তখন বলে, মহাশয়, আমাদের ওখানে একবার যাবেন। আমি বললুম, সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তখন বলে, আমাদের সেখানেও ভক্ত আছে দেখবেন। আমি হাসতে হাসতে বললুম, কি রকম ভক্ত আছে গো? 'গোপাল গোপাল' যারা বলেছিল, সেই রকম ভক্ত নাকি?

শিবনাথ বলেছিল, বেশি ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়

আমি বললুম, কি! চৈতন্যকে চিন্তা করে কি কেউ অচৈতন্য হয়ে যায়। তিনি নিত্যশুদ্ধবোধরূপ—যার বোধে সব বোধ কচ্ছে, যার চৈতন্যে সব চৈতন্যময়। বলে নাকি কে সাহেবদের হয়েছিল, বেশি চিন্তা করে বেহেড হয়ে গিছল। তা হতে পারে। তারা ঐহিক পদার্থ চিন্তা করে। 'ভাবেতে ভরল তনু হরল গেয়ান'—এতে যে জ্ঞানের কথা আছে, সে জ্ঞান মানে বাহ্যজ্ঞান।

কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল। দেখলুম রজ গুণ। তবে হিন্দু, জুতো বাইরে রাখলে। একটু কথা কয়ে দেখলুম ভিতরে কিছু নাই। জিজ্ঞাসা করলুম, মানুষের কর্তব্য কি? তা বলে, জগতের উপকার করবো। আমি বললুম, হ্যাঁ গা, তুমি কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা যে তুমি উপকার করবে? আমি বলি, নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু। তাঁরই জয়। শ্রীমতী যখন সহস্রধারা কলসী লয়ে যাচ্ছিলেন, জল একটুও পড়ে নাই, সকলে তার প্রশংসা করতে লাগল। বলে, এমন সতী হবে না। তখন শ্রীমতী বলেন, তোমরা আমার জয় কেন দাও, বল কৃষ্ণের জয়। কৃষ্ণের জয়। আমি তার দাসীমাত্র।

ঐ অবস্থায় ভাবে বিজয়ের বুকে পা দিলুম, এদিকে তো বিজয়কে এত ভক্তি করি। সেই বিজয়ের গায়ে পা দিলুম, তার কি বল দেখি। বিজয়ের বাপ ভাগবত পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে যেতো। বিজয় মাঝে মাঝে 'হরি হরি' বলে উঠে পড়ে। বাপ ওরূপ না হলে ছেলে অমন ভক্ত হয় না। আজকাল বিজয় যা কিছু দর্শন করছে সব ঠিক ঠিক। সাকার-নিরাকারের কথা বিজয় বললে, যেমন বহুরূপীর রং—লাল নীল সবুজও হচ্ছে, আবার কোনো রং নাই। কখনো সগুণ, কখনো নির্গুণ। বিজয় বেশ সরল। খুব উদার না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কাল অধর সেনের বাড়ি গিছল, তা যেন আপনার বাড়ি—সবাই যেন আপনার। বিষয়বুদ্ধি না গেলে উদার সরল হয় না। বিজয় এখন বেশ হয়েছে। হরি হরি বলতে বলতে মাটিতে

পড়ে যায়। চারটে রাত পর্যন্ত কীর্তন ধ্যান এই সব নিয়ে থাকে। এখন গেরুয়া পরে আছে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে একেবারে সাষ্টাঙ্গ। গদাধরের পাঠবাড়িতে আমার সঙ্গে গিছল। আমি বললুম, এখানে তিনি ধ্যান করতেন। সেই জায়গায় অমনি সাষ্টাঙ্গ।

বিজয়ের শাশুড়ি বললে, কই আমার কি হয়েছে? এখনও সকলের খেতে পারি না। আমি বললুম, সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা-তা খায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?

অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকত। খুব কারণ করত। আমার সন্তানভাব শুনে শেষে জিদ্। জিদ্ করে বলতে লাগল—স্ত্রীলোক লয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে—বীরভাবেরও সাধন আছে। আমি বললুম, কে জানে বাবু, আমার ওসব কিছুই ভাল লাগে না। আমার সন্তানভাব।

অচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিতো না। আমায় বলত, ছেলে ঈশ্বর দেখবেন, এসব ঈশ্বরেচ্ছা। আমি শুনে চুপ করে থাকতুম। একদিন একজন বড়মানুষ এসেছিল। আমায় বলে, মহাশয়, এ মোকদ্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এসেছি। আমি বললুম, বাপু, সে আমি নই, তোমার ভুল হয়েছে। সে অচলানন্দ।

ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হয়ে যায়। আমি আগে সব ছি করে দিছলুম। বিষয়ী সঙ্গ তো ত্যাগ করলুম, আবার মাঝে ভক্ত-সঙ্গ-ফঙ্গও ত্যাগ করলুম। দেখলুম সব পট্‌পট্ মরে যায়, আর শুনে ছট্‌ফট্ করি। এখন তবু একটু লোক নিয়ে থাকি।

৯॥ এই যে সব ইয়ং বেঙ্গল—এরা কি ভক্তি-টক্তির ধার ধারতো? মাথা নুইয়ে পেরণামটাও করতে জানতো না। মাথা নুইয়ে আগে পেরণাম করতে করতে তবে এরা ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে। কেশবের বাড়িতে দেখা করতে গেলুম, দেখি চেয়ারে বসে লিখছে। মাথা নুইয়ে পেরণাম করলুম, তাতে অমনি ঘাড় নেড়ে একটু সায় দিলে। তারপর আসবার সময় একেবারে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পেরণাম করলুম। তাতে হাত জোড় করে একবার মাথায় ঠেকাল। তারপর যত যাওয়া-আসা হতে লাগল, কথাবার্তা শুনতে লাগল, আর মাথা হেঁট করে পেরণাম করতে লাগলুম, তত ক্রমে ক্রমে তার মাথা নীচু হয়ে আসতে লাগল। নইলে আগে আগে ওরা কি এসব ভক্তি-টক্তি করা জানতো, না মানতো।

যদু মল্লিকের বাড়ি গিছলুম। একেবারে জিজ্ঞাসা করে গাড়ি-ভাড়া কত? যখন এরা বললে তিন টাকা দুই আনা, তখন একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আবার শুকুল ঠাকুর আড়ালে গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছে। সে বললে তিন টাকা চার আনা। তখন আবার আমাদের কাছে দৌড়ে আসে, বলে—ভাড়া কত? দালাল এসেছে। সে যদুকে বললে, বড় বাজারে চার কাঠা জায়গা বিক্রী আছে, নেবেন? যদু বলে, কত দাম? দামটা কিছু কমায় না? আমি বললুম, তুমি নেবে না, কেবল ঢং করছ, না? তখন আবার আমার

দিকে ফিরে হাসে। বিষয়ী লোকদের দস্তুরই—পাঁচটা লোক আনাগোনা করবে, বাজারে খুব নাম হবে। অধরের বাড়ি গিছল। তা আমি আবার বললুম, তুমি অধরের বাড়ি গিছলে, অধর বড় সন্তুষ্ট হয়েছে। তখন বলে, এঁ্যা এঁ্যা, সন্তুষ্ট হয়েছে। যদুর বাড়িতে—মল্লিক এসেছিল। বড় চতুর আর শঠ, চক্ষু দেখে বুঝতে পারলুম। চক্ষুর দিকে তাকিয়ে বললুম, চতুর হওয়া ভাল নয়। কাক বড় স্যায়না, চতুর—কিন্তু পরের গু খেয়ে মরে। আর দেখলুম লক্ষ্মীছাড়া। যদুর মা অবাক হয়ে বললে, বাবা, তুমি কেমন করে জানলে ওর কিছু নাই। চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছিলুম।

যাদের দেখি ঈশ্বরে মন নাই, তাদের আমি বলি, তোমরা একটু ঐখানে গিয়ে বোসো। অথবা বলি, যাও, বেশ বিল্ডিং দেখ গে। আবার দেখছি যে ভক্তদের সঙ্গে হাবাতে লোক এসেছে। তাদের ভারি বিষয়বুদ্ধি। তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। ওরা হয়তো আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় কথা বলছে। এদিকে এরা আর বসে থাকতে পারে না, ছটফট করছে। বারবার তাদেব কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলছে, কখন যাবে—কখন যাবে। তারা হয়তো বললে, দাঁড়াও না হে, আর একটু পরে যাবো। তখন এরা বিরক্ত হয়ে বলে, তবে তোমরা কথা কও, আমরা নৌকায় গিয়ে বসি।

প্রতাপের ভাই এসেছিল। এখানে কয়দিন ছিল। কাজকর্ম নাই। বলে, আমি এখানে থাকব। শুনলুম, মাগ ছেলে সব শ্বশুর-বাড়িতে রেখেছে। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আমি বকলুম, দেখ দেখি, ছেলেপিলে হয়েছে, তাদের কি আবার ও-পাড়ার লোক এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে, মানুষ করবে? লজ্জা করে না যে মাগ-ছেলেদের আর একজন খাওয়াচ্ছে, আর তাদের শ্বশুরবাড়ি ফেলে রেখেছে। আমরা অনেক বকলুম আর কাজকর্ম খুঁজে নিতে বললুম। তবে এখান থেকে যেতে চায়।

রামপ্রসন্ন কেবল ঐ রকম হো হো করে বেড়াচ্ছে। সেদিন

এখানে এসে বসল। একটুও কথা কইবে না—প্রাণায়াম করে নাক টিপে বসে রইল। খেতে দিলুম, তা খেলে না। আর একদিন ডেকে বসালুম। তা পায়ের উপর পা দিয়ে বসল—কাপ্তেনের দিকে পা-টা দিয়ে। ওর মার দুঃখ দেখে কাঁদি।

হরমোহন যখন প্রথমে এলো বেশ লক্ষণ ছিল। দেখবার জন্যে আমি ব্যাকুল হতুম। তখন বয়স ১৭।১৮ হবে। প্রায় ডেকে ডেকে পাঠাই, আর যায় না। এখন মাগকে এনে আলাদা বাসা করেছে। মামার বাড়ি ছিল, বেশ ছিল। সংসারের কোনো ঝঞ্ঝাট ছিল না। এখন আলাদা বাসা করে পরিবারের রোজ বাজার করে। সেদিন ওখানে গিয়েছিল। আমি বললুম, যা, এখান থেকে চলে যা—তোকে ছুঁতে আমার গা কেমন করে।

হরিপদ সেদিন এসেছিল। তার চক্ষু দেখলুম, যেন চড়ে রয়েছে। বললুম, তুই কি খুব ধ্যান করিস? তা মাথা হেঁট করে থাকে। আমি তখন বললুম, অতো নয় রে।

ভবনাথ বিয়ে করেছে। কিন্তু সমস্ত রাত্রি স্ত্রীর সঙ্গে কেবল ধর্মকথা কয়। ঈশ্বরের কথা নিয়ে দু'জনে থাকে। আমি বললুম, পরিবারের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি। তখন রেগে রোক করে বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকবো?

রাজেন্দ্র মিত্র—আটশ' টাকা মাইনে—প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন গা, মেলায় কেমন সব সাধু দেখলে? রাজেন্দ্র বললে, কই, তেমন সাধু দেখতে পেলুম না। একজনকে দেখলুম বটে, কিন্তু তিনিও টাকা লন।

সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) সানাই বাজত, আমি ভাবাবিষ্ট হয়ে যেতুম। একজন সাধু আমার অবস্থা দেখে বলত, এসব ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ।

পাগলীর মধুর ভাব। দক্ষিণেশ্বরে একদিন গিছল। হঠাৎ কান্না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন কাঁদছিস্? তা বললে, মাথা ব্যথা করছে। আর একদিন গিছল। আমি খেতে বসেছি। হঠাৎ বলছে, দয়া করলেন না। আমি উদারবুদ্ধিতে খাচ্ছি। তারপর বলছে, মনে ঠেললেন কেন? জিজ্ঞাসা করলুম, তোর কি ভাব? তা বললে, মধুর ভাব। আমি বললুম, আরে, আমার যে মাতৃযোনি। আমার যে সব মেয়েরা মা হয়। তখন বলে, তা আমি জানি না। তখন রামলালকে ডাকলুম। বললুম, ওরে রামলাল, কি মনে ঠ্যালা-ঠেলি বলছে, শোন্ দেখি। ওর এখনও সেই ভাব আছে।

আমায় একজন বলেছিল, মহাশয়, আমাকে সমাধিটা শিখিয়ে দিতে পারেন? বরিশালে বাড়ি একজন সদরওয়ালা বলেছিল, মহাশয়, আপনি প্রচার করতে আরম্ভ করুন। তাহলে আমিও কোমর বাঁধি।

মুখ্যু-শুখ্যু মানুষ, পণ্ডিত শশধর দেখা করতে আসবে শুনে বড় ভয় হল। পরণের কাপড়েরই হুঁশ থাকে না, কি বলতে কি বলব ভেবে একেবারে জড়সড় হলুম। মাকে বললুম, দেখিস্ মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর-মাস্তর কিছুই জানি না, দেখিস্। তারপর একে বলি 'তুই তখন থাকিস্', ওকে বলি 'তুই তখন আসিস্—তোদের সব দেখলে তবু ভরসা হবে।' পণ্ডিত যখন এসে বসল তখনও ভয় রয়েছে—চুপ করে বসে তার দিকেই দেখছি, তার কথাই শুনছি, এমন সময় দেখছি কি যেন তার ভিতরটা মা দেখিয়ে দিচ্ছে—শাস্তর-মাস্তর পড়লে কি হবে, বিবেক-বৈরাগ্য না হলে ও সব কিছুই নয়। তারপরই সড়সড় করে একটা মাথার দিকে উঠে গেল আর ভয়-ডর সব কোথায় চলে গেল। একেবারে বিভ্‌ভুল হয়ে গেলুম। মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভিতর থেকে যেন একটা কথার ফোয়ারা বেরুতে লাগল—এমনটা বোধ হতে লাগল। যত বেরুচ্ছে তত ভিতর থেকে যেন কে ঠেলে ঠেলে যোগান দিচ্ছে। ও

দেশে ধান মাপবার সময় যেমন একজন 'রামে রাম, দুইয়ে দুই' করে মাপে, আর একজন তার পেছনে বসে রাশ ঠেলে দেয়, সেইরূপ।

কিন্তু কি যে সব বলেছি তা কিছুই জানি না। যখন একটু হুঁশ হল তখন দেখছি কি যে সে কাঁদছে—একেবারে ভিজে গেছে। ঐ রকম একটা অবস্থা মাঝে মাঝে হয়। কেশব যেদিন খবর পাঠালে, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে, একজন সাহেবকে (পাদ্রি কুক্) সঙ্গে করে নিয়ে আসছে, সেদিনও ভয়ে কেবলই ঝাউ তলার দিকে যাচ্ছি। তারপর যখন তারা এলো আর জাহাজে উঠলুম, তখন এই রকমটা হয়ে গিছল। আর কত কি বলেছিলুম। পরে এরা সব বললে, খুব উপদেশ দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু বাবু কিছুই জানি নি।

রামনারায়ণ ডাক্তার আমার সঙ্গে তর্ক করছিল। হঠাৎ সেই অবস্থাটা হল। তারপর তাকে বললুম, তুমি কি বলছ? তাঁকে তর্ক করে কি বুঝবে? তাঁর সৃষ্টিই বা কি বুঝবে? তোমার কি ভারি তেঁতে বুদ্ধি। আমার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগল, আর আমার পা টিপতে লাগল।

তারক বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। দেখলুম, এর ভিতর থেকে শিখার ন্যায় জ্বলজ্বল করতে করতে কি বেরিয়ে গেল পেছু পেছু। কয়েকদিন পরে তারক আবার এলো। তখন সমাধিস্থ হয়ে তার বুকে পা দিলে —এর ভিতর যিনি আছেন।

অহংকারের বশে অথবা 'আমি কারু চেয়ে কোনো বিষয়ে কম নই'—এরূপ ভাব নিয়ে লোকে অপরের কথা সহজে মানতে চায় না। এর ভিতরে যে রয়েছে তার ছোঁয়া পেলে তাদের ঐভাব আর মাথা তুলতে পারে না। সাপ যেমন ফণা ধরতে গেলে অষুধের ছোঁয়ায় মাথা নুইয়ে নেয়, তাদের ভিতরের অহংকারের অবস্থাও তেমনি হয়। তাই তো কথা কইতে কইতে কৌশলে তাদের অঙ্গস্পর্শ করে থাকি।

কামারহাটি থেকে যে বামুনের মেয়েটি আসে, যার গোপালভাব—তার সব কত কি দর্শন হয়েছে। সে বলে, গোপাল তার কাছ থেকে হাত পেতে খেতে চায়। সেদিন ঐসব কত কি দেখে শুনে ভাবে প্রেমে উন্মাদ হয়ে উপস্থিত। খাওয়াতে দাওয়াতে একটু ঠাণ্ডা হল। থাকতে বললুম, কিন্তু থাকলে না। যাবার সময়ও সেইরূপ উন্মাদ—গায়ের কাপড় খুলে ভুঁয়ে লুটিয়ে যাচ্ছে, হুঁশ নাই। আমি আবার কাপড় তুলে দিয়ে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দি। খুব ভক্তি-বিশ্বাস।

এরা সব যেন হোমাপাখীর ছানার মত। হোমাপাখী আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে ডিম পাড়ে। সে ডিম অতি বেগে পৃথিবীর দিকে নামতে থাকে—ভয় হয় মাটিতে পড়ে বুঝি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় না, মাটি স্পর্শের আগেই ডিম ফেটে ছানা বেরোয় আর পাখা মেলে আবার আকাশের দিকে উড়ে যায়। এরাও তেমনি সংসারে আবদ্ধ হবার আগেই সংসার ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যাবে।

পঞ্চম পর্ব । ভাবপ্রসঙ্গ

১॥ আমার কি ভাব জানো? আমি খাই দাই থাকি—আর সব মা জানে। আমার তিন কথাতে গায়ে কাঁটা বেঁধে—গুরু, কর্তা আর বাবা। কেউ যদি আমায় গুরু বলে, আমি বলি, দূর শালা, গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোনো উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবপারের কাণ্ডারী। সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি করবে? তাঁর নাম করতে করতে কখনো ধারা পড়ে, কখনও পড়ে না। তাঁর ধ্যান করতে এক একদিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার এক একদিন কিছুই হল না। আমি যন্ত্র—তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। আমি গাড়ি, তিনি এন্‌জিনিয়র। আমি রথ, তিনি রথী। যেমন চালান তেমন চলি। যেমন করান তেমন করি।

তাঁর কাণ্ড মানুষে কি বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড। তাই আমি ওসব বুঝতে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেখেছি তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে। তাই ওসব চিন্তা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা করি। আমার ভাব কি রকম জান? হনুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হনুমান বললে, আমি বার, তিথি, নক্ষত্র—এসব কিছু জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি। আমার ঠিক ঐ ভাব। সেদিন বেণী পালের বাগানে উৎসব—দিন ভুল হয়ে গেল। অমুকদিন সংক্রান্তি, ভাল করে হরিনাম করব, এসব আর ঠিক থাকে না। তবে অমুক আসবে বললে মনে থাকে।

আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছে। একদিন ঘাসবনে কি কামড়ালে। আমি শুনেছিলুম, সাপে যদি আবার কামড়ায় তাহলে বিষ তুলে লয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে রইলুম। একজন এসে বললে, ও কি করছেন? সাপ যদি সেইখানটা আবার কামড়ায় তা হলে হয়। অন্য জায়গায় কামড়ালে হয় না। শরতের হিম ভাল শুনেছিলুম। কলকাতা থেকে গাড়ি করে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগাতে লাগলুম। তারপর অসুখ। বালকবৎ—আবার ওইসঙ্গে বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা—এসব অবস্থাও হয়। যখন জ্ঞান উপদেশ দেবে, তখন যুবার অবস্থা। আবার পৌগণ্ড অবস্থা। বারো-তেরো বছরের ছোকরার মত ফচ্‌কিমি করতে ইচ্ছা হয়। তাই ছোকরাদের নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি হয়। আমি একঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচরকম করে মাছ খাই। কখনও ঝোলে, কখনও ঝালে, অম্বলে, কখনো বা ভাজায়। আমি কখনও পূজা, কখনও জপ, কখনও বা ধ্যান, কখনও বা তাঁর নামগুণগান করি। কখনও তাঁর নাম করে নাচি।

আমার বিড়ালছার স্বভাব। বিড়ালছা কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা যেখানে রাখে—কখনও হেসলে রাখছে, কখনও বা বাবুদের বিছানায় রাখছে। ছোট ছেলে মাকে চায়। মার কত ঐশ্বর্য সে জানে না। জানতে চায়ও না। সে জানে আমার মা আছে, আমার ভাবনা কি? চাকরাণীর ছেলেও জানে আমার মা আছে। বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়া হয়, তা বলে, আমি মাকে বলে দেব, আমার মা আছে। আমারও সন্তানভাব।

আমি একজনকে বলেছিলুম, ও রজোগুণী সাধু—ওকে সিধে-টিধে দেওয়া কেন? আর একজন সাধু আমায় শিক্ষা দিলে, অমন কথা বোলো না, সাধু তিন প্রকার—সত্ত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী। সেই-দিন থেকে আমি সবরকম সাধুকে মানি। তিনিই বিদ্যা-অবিদ্যারূপে

লীলা করছেন। তুই-ই আমি প্রণাম করি। যার যা ভাব তার সেই ভাব আমি রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটিই রাখতে বলি। শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, একথা বোলো না—আমারই পথ সত্য, আর সব মিথ্যা, ভুল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—নানা পথ দিয়ে একজায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে আন্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবান লাভ হবে।

সবরকম সাধন এখানে হয়ে গেছে। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ। হঠযোগ পর্যন্ত—আয়ু বাড়াবার জন্য। এর ভিতরে একজন আছে। তা না হলে সমাধির পর ভক্তি-ভক্ত লয়ে কেমন করে আছি। কোয়ার সিং বলত, সমাধির পর ফিরে আসা লোক কখনও দেখি নাই—তুমিই নানক।

আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎ সমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে ওই সব লীলা উঠল আর ঐতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ঐতেই লয় হয়। তোমাদের বইয়ে কি আছে অত আমি জানি না। তাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য। এক একবার দেখি ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে। এক একবার দেখি বরষায় যেমন পৃথিবী জরে থাকে, সেইরূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জরে রয়েছে। কিন্তু এত তো দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না। কালীঘরে পূজা করতুম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়। যা দেখি তাই পূজা করি। একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে এই বিরাট মূর্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হল।

দেখছি তিনিই সব হয়েছেন। মানুষ আর যা জীব দেখছি যেন চামড়ার সব তয়েরি। তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন। যেমন একবার দেখেছিলুম—মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু—সব মোমের—সব একজিনিষে তয়েরি। মানুষকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে

হেলে দুলে বেড়াচ্ছেন। যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাসছে। বালিশটা এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ঢেউ লেগে একবার খুব উঁচু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে।

দেখছি তিনি-ই কামার, তিনি-ই বলি, তিনি-ই হাড়িকাঠ হয়েছেন। আমি চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম, এমন করলে ঈশ্বর আছেন আর এমন করলে কি ঈশ্বর নাই। চক্ষু খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা চন্দ্রসূর্য্য মধ্যে, জলেস্থলে সর্বভূতে তিনি আছেন। এই পাখা যেমন দেখছি সামনে প্রত্যক্ষ, ঠিক অমনি আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। আর দেখলুম, তিনি আর হৃদয়মধ্যে যিনি আছেন, এক ব্যক্তি। কথা কয়েছে। শুধু দর্শন নয়, কথা কয়েছে। বটতলায় দেখলুম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে তারপর কত হাসি। খেলার ছলে আঙ্গুল মট্‌কানো হল। তারপর কথা—কথা কয়েছে।

আমার প্রায় একটু অহং থাকে। সোনার একটু কণা, সোনার চাপে যত ঘসো না কেন, তবু একটু কণা থেকে যায়। আর যেমন বড় আগুন আর তার একটি ফিন্‌কি। বাহ্যজ্ঞান চলে যায়, কিন্তু প্রায় তিনি একটু অহং রেখে দেন—বিলাসের জন্য। আমি তুমি থাকলে তবে আস্বাদন হয়। কখনও কখনও সে আমিটুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম জড়সমাধি—নির্বিকল্প সমাধি। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না। একদিন ভাবে হালদার পুকুর দেখলুম। দেখি একজন ছোটলোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে আর হাতে তুলে এক একবার দেখছে। যেন দেখালে, পানা না ঠেললে জল দেখা যায় না—কর্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না।

আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমেছে; আগে ভারি

আঁট ছিল। যদি বলতুম নাইবো, গঙ্গায় নামা হল, মন্ত্রোচ্চারণ হল, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হল, বুঝি পুরো নাওয়া হল না। রামের বাড়ি গেলুম কলকাতায়। বলে ফেলেছি লুচি খাবো না। যখন খেতে দিলে তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাবো না বলেছি। তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। নক্‌স খেলা জান? সতের ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়। এক রকম তাস খেলা। যারা সতের ফোঁটার কমে থাকে তারা সেয়ানা। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। আমার কি অবস্থা বল দেখি। ওদেশে যাচ্ছি বর্দ্ধমান থেকে নেমে। আমি গরুর গাড়িতে বসে—এমন সময় ঝড়বৃষ্টি। আবার গাড়ির সঙ্গে কোথেকে লোক এসে জুটল। আমার সঙ্গে লোকেরা বলল, এরা ডাকাত। আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলুম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি, কখনও কালী কালী, কখনও হনুমান হনুমান। সব রকমই বলছি।

মা দেখিয়ে দেন যে তিনিই সব হয়েছেন। বাহ্যের পর ঝাউতলা থেকে আসছি, পঞ্চবটীর দিকে দেখি সঙ্গে একটি কুকুর আসছে। তখন পঞ্চবটীর কাছে একবার দাঁড়াই। মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান। আমি একবার মিউজিয়মে গিছলুম। তা দেখালে ইট পাথর গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখালে সঙ্গের গুণ কি। তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।

মা আমার সন্ধ্যাদি কর্ম উঠিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যাদি দ্বারা দেহ-মন শুদ্ধ করা। সে অবস্থা এখন আর নেই। আমার এই অবস্থার পর গঙ্গাজলে তর্পণ করতে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙ্গুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাচ্ছে। তখন হলধারীকে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলুম, দাদা, একি হল? হলধারী বললে, একে গলিতহস্ত বলে। ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্ম থাকে না।

২॥ দেহের অসুখ তা হবে। দেখছি পঞ্চভূতের দেহ। অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি। তার মধ্যে এই রূপটিও দেখছি। এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি। আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙেছিল, তারই এই অসুখ করেছে। কারেই বা বলবে, কেই বা বুঝবে। শরীরটা যেন বাঁখারি-সাজানো কাপড়মোড়া, সেইটে নড়ছে। যেন কুমড়ো—শাঁসবীচি ফেলা। ভিতরে কামাদি আসক্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষ্কার। আর অন্তরে বাহিরে দুই দেখছি সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ কেবল একটা খোল আশ্রয় করে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন। এইটি দেখছি। দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল—সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো। বালিশের খোল যেমন হয়—কোনোটা খেরোর, কোনোটা ছিটের, কোনোটা বা অন্য কাপড়ের। কোনোটা চারকোনা, কোনোটা গোল—সেই রকম। আর বালিশের ওই সব খোলের ভিতর যেমন একই জিনিষ তুলো ভরা থাকে, সেই রকম ওই মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্বত—সব খোলগুলোর ভিতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাই, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানারকম সেজে ভিতর থেকে উঁকি মারছেন। একটা অবস্থা হয়েছিল যখন সদা-সর্বক্ষণ ঐ রকম দেখতুম। ঐ রকম অবস্থা দেখে বুঝতে না পেরে সকলে বোঝাতে, শান্ত করতে এলো।

রামলালের মা-টা সব কত কি বলে কাঁদতে লাগল। তাদের দিকে চেয়ে দেখছি কি যে ঐ মা-ই নানা রকমে সেজে এসে ঐ রকম করছে। ঢং দেখে হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম আর বলতে লাগলুম, বেশ সেজেছ! একদিন কালীঘরে আসনে বসে মাকে চিন্তা করছি, কিছুতেই মার মূর্তি মনে আনতে পারলুম না। তারপর দেখি কি—রমণী বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান করতে আসত, তার মত হয়ে পূজার ঘটের পাশ থেকে উঁকি মারছে। দেখে হাসি আর বলি, ওমা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছা হয়েছে—তা বেশ, ঐ রূপেই আজ পূজো নে। ঐ রকম করে বুঝিয়ে দিলে—বেশ্যা ও আমি, আমি ছাড়া কিছু নেই। আর একদিন গাড়ি করে মেছোবাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে, আর মোহিনী হয়ে লোকের মন ভুলুচ্ছে। দেখে অবাক হয়ে বললুম, মা, তুই এখানে এইভাবে রয়েছিস্। বলে প্রণাম করলুম।

সব দেখছি একএকটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে। দেখছি যখন তাতে মনের যোগ হয় তখন কষ্ট একধারে পড়ে থাকে। এখন দেখছি, কেবল একটা চামড়া-ঢাকা অখণ্ড, আর একপাশে গলার ঘা-টা পড়ে রয়েছে।

অনেক মত অনেক পথ দেখলুম। এসব আর ভাল লাগে না। পরস্পর সব বিবাদ করে। শেষ এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ, আমি তার অংশ, তিনি প্রভু, আমি তার দাস। আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি। সেদিন দেখলুম, খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাইরে এলো। এসে বলল, আমি যুগে যুগে অবতার। তখন ভাবলুম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐসব কথা বলছি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলুম। তখন দেখি আপনি বলছে, শক্তির আরাধনা

চৈতন্যও করেছিল। দেখলুম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য। দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু। যার শেষ জন্ম সেই এখানে আসবে। যে ঈশ্বরকে একবারও ঠিক ঠিক ডেকেছে তাকে এখানে আসতে হবেই হবে।

সেদিন কলকাতায় গেলুম। গাড়িতে যেতে যেতে দেখলুম, জীব সব নিম্নদৃষ্টি, সব্বাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে। সকলেরই মন কামিনী-কাঞ্চনে। তবে দুএকটি দেখলুম উর্ধ্বদৃষ্টি—ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

আগে অনেক দেখতুম। এখন [illegible]ভাবে তত দর্শন হয় না। এখন প্রকৃতিভাব কম পড়ছে, বেটাছেলের ভাব আসছে। তাই ভাব অন্তরে, বাহিরে তত প্রকাশ নাই। আবার অবস্থা বদলাচ্ছে। প্রসাদ খাওয়া উঠে গেল। সত্য মিথ্যা এক হয়ে যাচ্ছে। আবার কি দেখেছিলুম জান? ঈশ্বরীয় রূপ। ভগবতী মূর্তি—পেটের ভিতর ছেলে—তাকে বার করে আবার গিলে ফেলছে, ভিতরে যতটা যাচ্ছে ততটা শূন্য হয়ে। আমায় দেখাচ্ছে যে সব শূন্য। যেন বলছে, লাগ্ লাগ্, লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্।

নির্বিকল্প অবস্থায় উঠলে তখন তো আর আমি-তুমি, দেখা-শুনা, বলা-কহা কিচ্ছুই থাকে না। সেখান থেকে দুতিন ধাপ নেমে এসেও এতটা ঝোঁক থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিষ নিয়ে ব্যবহার চলে না। তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারী সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সে সকলের দিকে যায় না, এক জায়গা থেকেই মুখে উঠবে। এমন সব অবস্থা হয়। তখন ভাতডাল তরকারী পায়েস সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়। এমন একটা অবস্থা হয়, তখন কাউকে ছুঁতে পারি না। কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠি। ভাবে আবার একটা অবস্থা হয়, তখন খালি বাবুরামকে ছুঁতে পারি। ও যদি তখন ধরে তো কষ্ট হয় না। ও খাইয়ে দিলে তবে খেতে পারি। সেবার যাত্রার সময় মধু ডাক্তারের

চক্ষে ধারা দেখে তার দিকে চেয়েছিলুম। আর কারু দিকে তাকাতে পারলুম না।

একজন বাউল এসেছিল। তা আমি বললুম, তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে? খোলা নেমেছে? যত রস জ্বাল দেবে তত রেফাইন হবে। প্রথম, আঁকের রস, তারপর দোলো, তারপর চিনি, তারপর মিছরি, ওলা—এই সব। ক্রমে ক্রমে আরো রেফাইন হচ্ছে।

একদিন আমি দালানে খাচ্ছি, একজন ঘোষপাড়ার মতের লোক এলো। এসে বলল, তুমি খাচ্ছ, না কারুকে খাওয়াচ্ছ? অর্থাৎ যে সিদ্ধ হয় সে দেখে যে অন্তরে ভগবান আছেন। যারা এ মতে সিদ্ধ হয় তারা অন্য মতের লোকদের বলে জীব। বিজাতীয় লোক থাকলে কথা কবে না। বলে, এখানে জীব আছে। ওদেশে এই মতের লোক একজন দেখেছি। সরী পাথর—মেয়ে মানুষ। আমি একদিন তার বাড়িতে হৃদের সঙ্গে বেড়াতে গিছলুম। বেশ তুলসীবন করেছে। কড়াই মুড়ি দিলে, দুটি খেলুম। হৃদে অনেক খেয়ে ফেললে। তারপরে অসুখ।

বটতলায় সন্ন্যাসীকে দেখলুম। যে-আসনে গুরুপাদুকা রেখেছে তারই উপরে শালগ্রাম রেখেছে ও পূজা করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, যদি এতদূর জ্ঞান হয়ে থাকে তবে পূজা করা কেন? সন্ন্যাসী বললে, সবই করা যাচ্ছে, এও একটা করলুম। কখনও ফুলটা এপায়ে দিলুম, আবার কখনও একটা ফুল ওপায়ে দিলুম। দেহ থাকতে কর্মত্যাগ করবার যো নাই—পাঁক থাকতে ভুড়ভুড়ি হবেই।

জনাইয়ের মুখুয্যে প্রথমে লম্বা লম্বা কথা বলেছিল। তারপর শেষকালে বেশ বুঝে গেল। আমি যদি ভাল থাকতুম ওদের সঙ্গে আর খানিকটা কথা কইতুম। জ্ঞান জ্ঞান কি করলেই হয়।

আমি দেখছি, যেখানে থাকি রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎসংসার রামের অযোধ্যা। গৌরাঙ্গের সাঙ্গপাঙ্গ দেখেছিলুম।

ভাবে নয়, এই চোখে। আগে এমন অবস্থা ছিল যে সাদা চোখে সব দর্শন হত।' এখন তো ভাবে হয়।

অনেক লোক যখন আমায় দেবতা বলে মানবে, শ্রদ্ধাভক্তি করবে, তখনই এর অন্তর্ধান হবে। যখন যার-তার হাতে খাবো, কলকাতায় রাত কাটাবো আর খাবারের অগ্রভাগ অন্যকে আগে খাইয়ে পরে বাকিটা নিজে খাব, তখন জানবে দেহরক্ষা করার আর বেশি দেরী নেই। শেষকালে আর কিছু খাব না, কেবল পায়েস খেয়ে থাকব। যাবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব। যখন অধিক লোকে জানতে পারবে, কানাকানি করবে, তখন এই খোলটা আর থাকবে না, মার ইচ্ছায় ভেঙ্গে যাবে। কারা অন্তরঙ্গ আর কারা বহিরঙ্গ তা এসময় বোঝা যাবে।

শরীরটা কিছুদিন থাকত, লোকের চৈতন্য হত। তা রাখবে না। সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে। একে কলিতে ধ্যানজপ নেই। এখানে সব আছে। নাগাদ মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, তেঁতুল পর্যন্ত। এর ভিতর ঈশ্বরের সত্ত্বা রয়েছে, তাই লোকের এত আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়। সে টান সে আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।

বাউলের দল হঠাৎ এলো, নাচলে, গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গেল। এলো গেল—কেউ চিনলে না। কারেই বা বলব—কেই বা বুঝবে। দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই। এক একবার বলি, আর যেন আসতে না হয়। তবে যে দেহধারণ করা, এটি ভক্তের জন্য। বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না। আমার একটি আধটি সাধ ছিল। বলেছিলুম, মা, কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগীর সঙ্গ দাও। আর বলেছিলুম, তোর জ্ঞানী ও ভক্তের সঙ্গ করব, তাই একটু শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি—এখানে ওখানে যেতে পারি। তা হাঁটবার

শক্তি দিলে না কিন্তু। হাত যখন ভেঙ্গে গেল মাকে বললুম, মা, বড় লাগছে। তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ি আর তার এন্‌জিনিয়ার। গাড়ির একটা আধটা ইস্ক্রু আল্‌গা হয়ে গেছে। এন্‌জিনিয়ার যেরূপ চালাচ্ছে, গাড়ি সেরূপ চলছে। নিজের কোনো ক্ষমতা নাই। তবে দেহের যত্ন করি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করব, তাঁর নামগুণ গাইব, তাঁর জ্ঞানী ভক্ত দেখে দেখে বেড়াব।

তিনিই বিদ্যামায়া রেখে দিয়েছেন—লোকের জন্য, ভক্তের জন্য। কিন্তু বিদ্যামায়া থাকলে আবার আসতে হবে। অবতারাদি বিদ্যামায়া রাখে। একটু বাসনা থাকলেই আসতে হয়—ফিরে ফিরে আসতে হয়। সব বাসনা গেলে মুক্তি। ভক্তেরা কিন্তু মুক্তি চায় না। দেখেছি আমার সব বাসনা যায় নাই। এক সাধুর আলোয়ান দেখে বাসনা হয়েছিল, ঐ রকম পরি। এখনও আছে।

জানি কিনা আর একবার আসতে হবে। বায়ুকোণে আর একবার দেহ হবে। দু'শ বছর পরে ঐদিকে আসতে হবে। তখন অনেকে মুক্তিলাভ করবে। যারা তখন মুক্তিলাভ করবে না তাদের সেজন্য অনেককাল অপেক্ষা করতে হবে।

তোমাদের কি আর বলব।

আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক্।

জীবন পঞ্জী

[খ্রীষ্টাব্দ অনুসারে]

১৮৩৬—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম।

জন্মভূমি: হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রাম।

জন্মতিথি: বাংলা ১২৪২ সনের ৬ই ফাল্গুন বুধবার শুক্লাদ্বিতীয়া তিথির ব্রাহ্মমুহূর্তে বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ। ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী (পাশ্চাত্য মতে মধ্যরাত্রির পর জন্ম বলিয়া ১৮ই ফেব্রুয়ারী)।

১৮৪১—পাঁচ বৎসর বয়সে লাহাবাবুদের পাঠশালায় প্রেরণ।

প্রথম ভাবসমাধি। লীলাপ্রসঙ্গ অনুযায়ী ৫।৬ বছর বয়সে, কিন্তু কথামৃত অনুসারে ১০।১১ বছর বয়সে।

১৮৪২—পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু।

বাংলা ১২৪৯ সনে বিজয়া-দশমীর দিন।

১৮৪৩—দ্বিতীয়বার ভাব সমাধি।

বিশালাক্ষী দেবী দর্শনকালে আনুমানিক ৮ বছর বয়সে।

১৮৪৫—উপনয়ন।

বয়স ৯ বৎসর উত্তীর্ণ প্রায়। ধনী কামারনীর কাছ থেকে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণ ও তাকে মাতৃসম্বোধন।

১৮৪৭ (আনুঃ)—পাইনদের বাড়ির যাত্রায় শিবের অভিনয় ও ভাবসমাধি। বয়স আনুমানিক ১০।১১ বছর।

১৮৫০—বড়দাদা রামকুমারের কলকাতা ঝামাপুকুরে টোল প্রতিষ্ঠা ও অধ্যাপনা।

১৮৫৩—শ্রীরামকৃষ্ণের কলকাতা আগমন ও ঝামাপুকুর টোলে অবস্থান। বয়স প্রায় ১৭।

১৮৫৫—দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা।

বাংলা ১২৬২ সনের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্নানযাত্রার দিন রাণী রাসমণি দ্বারা মন্দির প্রতিষ্ঠিত। শ্রীযুক্ত রামকুমারের পূজকের পদ গ্রহণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ

কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে নিযুক্ত। বয়স ১৯।২০ বছর। ভাদ্র মাসে ঠাকুরের শ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার গ্রহণ। কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ।

১৮৫৬-৫৭—কালীপূজকের পদগ্রহণ।

ভ্রাতা রামকুমারের মৃত্যু। শ্রীশ্রীজগন্মাতার দিব্যদর্শন লাভ। ভাবোন্মাদ ও ভূকৈলাসের বৈদ্যের ঔষধসেবন।

পাপ-পুরুষ বিনাশ ও রাণী রাসমণিকে চপেটাঘাত। বায়ুরোগের জন্য কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের ঔষধসেবন।

১৮৫৮—খুড়তুতো ভাই রামতারক চট্টোপাধ্যায়ের (হলধারী) পূজকরূপে কালীমন্দিরে নিয়োগ।

পাণিহাটি মহোৎসবে গমন ও বৈষ্ণবচরণের সঙ্গে পরিচয়।

১৮৫৯—অসুস্থতার জন্য কামারপুকুরে গমন। ওঝা দ্বারা পূজাপাঠ ও চণ্ড নামানো।

বৈশাখ মাসে বিবাহ। জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা সারদামণির সহিত। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স ২৩ বছর পূর্ণ।

১৮৬০—ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন। মথুরবাবুর ঠাকুরকে শিবকালীরূপে দর্শন।

দ্বিতীয়বার দিব্যোন্মাদ ও চিকিৎসা।

১৮৬১—রাণী রাসমণির মৃত্যু।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্রসাধনা। ঠাকুরকে অবতাররূপে ভৈরবীর সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা।

১৮৬২—৬৪ তন্ত্রের সাধন সম্পূর্ণ।

১৮৬৩—পদ্মলোচন পণ্ডিতের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয়। দক্ষিণেশ্বরে মথুরবাবুর অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান। ঠাকুরের আদেশে মথুরবাবুর সাধুসেবার ব্যবস্থা। 'জটাধারী' রামাইত সাধুর আগমন এবং ঠাকুরের বাৎসল্য ও মধুর-ভাবসাধন। মধুর ভাবসাধনকালে স্ত্রীবেশগ্রহণ ও জানবাজারে মথুরবাবুর বাড়িতে মহিলাদের সঙ্গে সখীভাবে অবস্থান। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। মধুর ভাবসিদ্ধি।

[খ্রীষ্টাব্দ অনুসারে]

১৮৬৪—অদ্বৈতসাধক তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ এবং বেদান্তসাধন।

নির্বিকল্প সমাধিলাভ। তোতাপুরীর ঠাকুরকে 'রামকৃষ্ণ' আখ্যাদান। হলধারী ও তোতাপুরীর অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠকালে ঠাকুরের রামসীতা মূর্ত্তি দর্শন।

১৮৬৫—হলধারীর অবসরগ্রহণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের পূজকপদ গ্রহণ। তোতাপুরীর জগন্মাতাকে স্বীকার ও দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ।

১৮৬৬—ঠাকুরের ছয়মাস অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান। মথুরবাবুর পত্নী জগদম্বা দাসীকে কঠিন পীড়া থেকে মুক্তিদান। ঠাকুরের কঠিন আমাশয় রোগ ও হৃদয়ের সেবা।

গোবিন্দ রায়ের কাছে মুসলমান ধর্মসাধন।

১৮৬৭—ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সঙ্গে ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন। সারদাদেবীর জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুরে আগমন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর বিদায় গ্রহণ। প্রায় ৭ মাস পর দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন। বয়স ৩২ বছর।

১৮৬৮—তীর্থযাত্রা।

সঙ্গে মথুরবাবু ও হৃদয়। মাঘ মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত তীর্থভ্রমণ। বৈদ্যনাথধামে দরিদ্রসেবা। বৈদ্যনাথধাম থেকে কাশীধামে গমন ও ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দর্শন। কাশী থেকে প্রয়াগ গমন ও পুনরায় কাশীতে ১ পক্ষকাল বাস। কাশী থেকে শ্রীবৃন্দাবন আগমন। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন প্রভৃতি দর্শন। নিধুবনে গঙ্গামায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বৃন্দাবন থেকে পুনরায় কাশী আগমন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ। দক্ষিণেশ্বর প্রত্যাগমন ও পঞ্চবটীতে মহোৎসব। হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও দ্বিতীয়বার বিবাহ।

১৮৬৯—ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট।

১৮৭০—মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুরের রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা। কলুটোলা হরিসভায় ঠাকুরের ভাবাবেশে চৈতন্যআসন অধিকার। কালনা নবদ্বীপ ইত্যাদি দর্শন।

১৮৭১—গৌরী পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয়।

জুলাই মাসে মথুরবাবুর মৃত্যু।

১৮৭২—সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও নহবত ঘরে ঠাকুরের মাতার সঙ্গে অবস্থান।

ঠাকুর কর্তৃক ষোড়শী পূজা।

১৮৭৩—সারদাদেবীর কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন ও ঠাকুরের মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরের মৃত্যু।

১৮৭৪—শম্ভুচরণ মল্লিক কর্তৃক ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ। সারদাদেবীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন এবং তাঁর জন্য শম্ভুবাবুর গৃহনির্মাণ। শম্ভু মল্লিকের কাছে ঠাকুরের বাইবেল শ্রবণ এবং যদু মল্লিকের উদ্যান বাটীতে ও পরে পঞ্চবটীতে যীশুখ্রীষ্টের দর্শনলাভ।

১৮৭৫—বেলঘরিয়ায় জয়গোপাল সেনের উদ্যানবাটিকায় কেশব সেনের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ। সঙ্গে হৃদয়। নেপালের বিশ্বনাথ উপাধ্যায় 'কাপ্তেন', মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ।

ভাবে শ্রীচৈতন্যের নগরকীর্তনের দৃশ্য দর্শন। কামারপুকুর সিওড়গ্রামে গমন এবং নিকটস্থ ফুলুই শ্যামবাজারে নটবর গোস্বামীর গৃহে ৭ দিন বৈষ্ণবদের কীর্তনশ্রবণ। সারদাদেবীর পীড়া ও জয়রামবাটী গমন।

১৮৭৬—মাতা চন্দ্রমণির মৃত্যু।

বার বার চেষ্টা সত্ত্বে তর্পণে অক্ষমতা।

১৮৭৭-৭৮—ঠাকুর ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

সারদাদেবীর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

১৮৭৯—চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন আরম্ভ। ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্রের আগমন। রামচন্দ্র দত্তের ভৃত্য লাটুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান ও পরে অদ্ভুতানন্দ নামগ্রহণ। বুড়ো গোপালের (অদ্বৈতানন্দ) আগমন। চুনী, নিত্যগোপাল, তারক প্রভৃতির আগমন।

১৮৮০—হৃদয়ের রূঢ় ব্যবহারে সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ।

১৮৮১—মথুরবাবুর স্ত্রী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু। নরেন্দ্রনাথ দত্তের (বিবেকানন্দ)

আগমন। রাখাল (ব্রহ্মানন্দ), বাবুরাম (প্রেমানন্দ), নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ), ভবনাথ, বলরাম প্রভৃতির আগমন।

১৮৮২—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থ প্রণেতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের (মাষ্টারমহাশয় 'শ্রীম') আগমন।

১৮৮৩—শশী (রামকৃষ্ণানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ), তারক (শিবানন্দ), অধর, ছোটগোপাল প্রভৃতি ভক্তের আগমন।

১৮৮৪—কেশব সেনের মৃত্যু। সারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় আগমন ও অবস্থান।

গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ), কালী (অভেদানন্দ), হরিনাথ (তুরীয়ানন্দ), নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির আগমন।

১৮৮৫—সুবোধ (সুবোধানন্দ), হরিপ্রসন্ন (বিজ্ঞানানন্দ), তুলসী (নির্মলানন্দ), পূর্ণ, ছোট নরেন প্রভৃতিব আগমন।

ঠাকুরের ব্যাধি ও গলায় যন্ত্রণা। অসুস্থদেহে পাণিহাটির মহোৎসবে যোগদান ও রোগবৃদ্ধি। চিকিৎসার জন্য দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতা শ্যামপুকুরে আগমন ও শিষ্যগণের সেবা। নটী বিনোদিনীর ঠাকুরদর্শনে ছদ্মবেশে শ্যামপুকুরে আগমন ও আশীর্ব্বাদলাভ। তিনমাস পর কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আগমন।

১৮৮৬—১লা জানুয়ারী ('কল্পতরুদিবস') ভক্তগণকে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ ও আধ্যাত্মিক শক্তিদান। ১৫ই আগষ্ট রবিবার ঠাকুরের দেহত্যাগ। বাংলা ১২৯৩ সনের শ্রাবণ-সংক্রান্তি তিথি। কাশীপুব শ্মশানক্ষেত্রে শেষকৃত্য সমাপন। ৫১ বৎসর বয়সে লীলাসংবরণ।

পরিশিষ্ট

ব্যক্তিপরিচিতি

সেজবাবু—রানী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস। মথুরবাবু নামেই বিশেষ পরিচিত।

হলধারী—শ্রীরামকৃষ্ণের খুড়তুতো ভাই রামতারক চট্টোপাধ্যায়।

হৃদে—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়। হৃদু বলেও সম্বোধন করতেন।

রাখাল—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ও মানসপুত্র রাখালচন্দ্র ঘোষ। পরে ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামে সুপরিচিত।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন—তৎকালীন কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ।

কৃষ্ণকিশোর—আড়িয়াদহ-নিবাসী রামভক্ত কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য। এঁর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের যাতায়াত ছিল।

গৌরী—বিদ্বান্ শক্তিসাধক গৌরীকান্ত পণ্ডিত। বাঁকুড়া জেলার ইঁদেশ থেকে ইনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন।

বৈষ্ণবচরণ—উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র এবং ভক্তবৈষ্ণব। সেকালে কলকাতার পণ্ডিতমহলে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

দেবেন ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বামনী—ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দেবী। শ্রীরামকৃষ্ণকে তন্ত্রসাধনায় সহায়তা করেন।

পদ্মলোচন—বর্দ্ধমান রাজার সভাপণ্ডিত। তাঁর খ্যাতি বঙ্গের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার জ্ঞানে ভক্তি করতেন।

জটাধারী—জনৈক রামভক্ত সাধু। তাঁর কাছে 'রামলালা' অর্থাৎ বালক-রামচন্দ্রের মূর্তি ছিল। বাৎসল্যভাবের সাধক ছিলেন।

ন্যাংটা—অদ্বৈতবাদী নাগা সন্ন্যাসী তোতাপুরী। শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদান্তসাধনায় ও সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করেন।

ভোলানাথ—কালীবাড়ির মুহুরী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। পরে খাজাঞ্চী হন।

রাজকুমার—অচলানন্দ নামে তান্ত্রিক সাধক।

গোবিন্দ রায়—জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুফী-সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

রামলালের ভাই—শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যমভ্রাতা রামেশ্বরের পুত্র শিবরাম।

গঙ্গামায়ী—বৃন্দাবনের জনৈকা বৃদ্ধা ভক্তিমতী রমণী। শ্রীরামকৃষ্ণকে বাৎসল্য-ভাবে গভীর স্নেহ করতেন ও 'দুলালী' বলে সম্বোধন করতেন।

দয়ানন্দ—আর্যমত-প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

নারায়ণ শাস্ত্রী—ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ। ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে সন্ন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মাইকেল—কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

জয়নারায়ণ—জনৈক পণ্ডিত। কাশীতে গিয়ে দেহত্যাগ করেন।

অক্ষয়—শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমারের পুত্র।

শম্ভু মল্লিক—সিঁদুরিয়াপটি-নিবাসী ধনী ও দানবীর। শ্রীরামকৃষ্ণের যথেষ্ট সেবা করেছিলেন।

প্রসন্ন—কেশব সেনের দলভুক্ত জনৈক ব্রাহ্মভক্ত।

প্রতাপ—ব্রাহ্মসমাজের বিখ্যাত প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

কাপ্তেন—নেপাল রাজ-সরকারের কর্মচারী বিশ্বনাথ উপাধ্যায়।

সৌরীন্দ্র ঠাকুর—রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

পূর্ণ—শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ স্নেহভাজন পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় ঠাকুরের কাছে আসেন।

হাজরা—প্রতাপচন্দ্র হাজরা। ইনি কিছুকাল দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে বাস করেন।

নরেন্দ্র—নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পরে স্বামী বিবেকানন্দ।

ভবনাথ—শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ প্রিয়পাত্র ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মনোমোহন—শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহস্থ-ভক্ত মনোমোহন মিত্র।

বলরাম—বাগবাজারের পরম বৈষ্ণবভক্ত বলরাম বসু। দীর্ঘদিন ঠাকুরের সেব করেন।

বঙ্কিম—সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিজয়—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

পাগলী—মধুরভাব সাধিকা জনৈকা উদাসিনী।

শশধর পণ্ডিত—শশধর তর্কচূড়ামণি। এঁর বিজ্ঞানসম্মত ধর্মব্যাখ্যা সেকা কলকাতায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

তারক—তারকচন্দ্র ঘোষাল। পরে স্বামী শিবানন্দ।

সংগ্রহ-সূত্র

• প্রথম পর্ব •

আলোচ্য পুস্তকের অংশ [ক্রমানুসারে]	আকর গ্রন্থ	
পর্ববিভাগ ১		
আমার বাবা যখন…রক্তবর্ণ হয়ে যেত	কথামৃত,	৪র্থ । ৪৮ পৃষ্ঠা
বাবা কখনো শূদ্রের দান…মান্যভক্তি করত	লীলাপ্রসঙ্গ,	১ম । ৯৪ "
আমার মা ছিলেন…বড় ভালবাসতেন	"	১ম । ৯৪ "
বাবা গয়াতে গিছলেন…তা হয়ে যাবে	কথামৃত,	৪র্থ । ৪৬ "
ওদেশে ছেলেবেলায়…রকমই আলাদা	"	৫ম । ৪৫-৪৬ "
"ধোয়ো না ধোয়ো না…দলে ছিলুম	"	৫ম । ৪৭ "
লাহাদের ওখানে সাধুরা…কইতে পারি না	"	৪র্থ । ৮৩ "
আমার দশ-এগার বছর…বিহ্বল হয়েছিলুম	"	৫ম । ২৫ "
ওদেশে ছেলেদের…বেহুঁশ হয়ে যাই	লীলাপ্র,	২য় । ৪৪ "
বিশালাক্ষী দেখতে গিয়েও…একেবারে বাহ্যশূন্য	কথামৃত,	৪র্থ । ২৯৫ "
ছেলেবেলা ওদেশে ডেপুটি…কম গা	"	৪র্থ । ১৪৭ "
একজনদের বাড়ি প্রায়…ঢুকতে পারত না	"	৫ম । ৭৪ "
শ্রীরাম আমার সঙ্গে…বলতে থাকত	"	৩য় । ২০৭ "
পর্ববিভাগ ২		
যখন বাইশ-তেইশ…মানে পরমাত্মা	"	৪র্থ । ২৯৫ "
দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার…চলে গেল	"	৪র্থ । ১৪৪ "
	"	২য় । ১২৮ "
দক্ষিণেশ্বরে একটি সন্ন্যাসী…ঢং নাই	"	৪র্থ । ২৮৫ "
কি অবস্থাই গিয়েছে… আষ্টে গন্ধ	"	২য় । ৬৩ "
তাকে দর্শন করতে হলে…গা ভেসে যেত	"	২য় । ৬৭ "
দেহের দিকে একেবারেই…তাই অত কাঁদছে	লীলাপ্র,	২য় । ১৪১ "

আলোচ্য পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
সকলেরই যে বেশি…ডাকতুম, কাঁদতুম	কথামৃত,	২য় । ৯৩ পৃষ্ঠা
মার দেখা পেলুম না…পড়ে গেলুম	লীলাপ্র,	২য় । ১১৩-১৪ ”
সেইদিন থেকে আর…ভয় হয়	কথামৃত,	১ম । ২৩৯ ”

পর্ববিভাগ ৩

আলোচ্য পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
দক্ষিণেশ্বরে যখন আমার…বললে, হ্যাঁ	”	৪র্থ । ২২১ ”
কি অবস্থাই গেছে…টেনে আনা	”	২য় । ১৫১ ”
আমি 'মা' বলে…দেখা দিতে হবে	”	৪র্থ । ৬৮ ”
আমি ব্যাকুল হয়ে…মহাবায়ুতে লীন	”	৫ম । ১০৪ ”
		১ম । ২৪৪ ”
'মা মা' বলে এমন…বোঝাচ্ছে, শেখাচ্ছে	লীলাপ্র,	২য় । ১১৫ ”
মার নাট মন্দিরের…ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদতুম	”	২য় । ১১৭ ”
আমি কাঁদতুম আর…দেখিয়ে দিয়েছেন	কথামৃত,	২য় । ২৩২ ”
		৪র্থ । ২৪৯ ”
মাকে কেঁদে কেঁদে…দেখিয়ে দিয়েছেন	”	৪র্থ । ৫৯ ”
আমায় মা কালীঘরে…কথা বোলো না	”	৪র্থ । ৩৭ ”

পর্ববিভাগ ৪

আলোচ্য পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
সাধনার সময় ধ্যান…আটকে দেয়	”	৩য় । ১৫৮ ”
সন্ধ্যাপূজা করতে করতে…কষ্ট পেয়েছিলুম	লীলাপ্র,	২য় । ১২৭-২৮ ”
যখন এই অবস্থা…রাগ হল না	কথামৃত,	৩য় । ১৯০ ”
এই অবস্থার পর…বন্ধ করতুম	”	২য় । ১ ”
	”	৩য় । ২০৭ ”
আমি মার কাছে…শুদ্ধাভক্তি দাও	”	১ম । ৪৬ ”
দেখ জ্ঞান পর্যন্ত…বাকী থাকে	”	১ম । ১৬২ ”
যখন এই সব…পারলুম না	”	১ম । ১০৪ ”
পঞ্চবটীর কাছে…হৃদয়ে থেকো	”	১ম । ১৭২ ”
একদিন পঞ্চবটীর…ব্যাঙটারও যন্ত্রণা	”	১ম । ৭৫ ”
কালীঘাটের চন্দ্রহালদার…বারণ করলুম	”	১ম । ২৩২ ”

আলোচ্য পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
পর্ববিভাগ ৫		
কি অবস্থাই গেছে…জোড় করে রইল	"	২য় । ৩, ৫৬ পৃষ্ঠা
তখন আমার উন্মাদ…তাই বললুম	"	৪র্থ । ৭৫ "
তিনি আমায় নানাভাবে…উন্মাদের অবস্থা	"	৪র্থ । ১৮২ "
সে সময়ে খাওয়া-দাওয়া…বেড়ে গিছল	লীলাপ্র,	২য় । ১৪২ "
আমি সীতামূর্তি দর্শন…বাঁচবে না	কথামৃত,	৪র্থ । ৩৮ "
পঞ্চবটী তলায় একদিন…আর হয় নাই	লীলাপ্র,	২য় । ১৪৩-৪৪ "
সে সময় সব মিলত…রাখাল হল	কথামৃত,	২য় । ৬০ "
	"	২য় । ৯৩-৯৪ "
পর্ববিভাগ ৬		
আমার উন্মাদ অবস্থা…মুখে আগুন	কথামৃত,	২য় । ১২৮ "
সেজবাবুর সঙ্গে…ভাত খাব	"	২য় । ১২৮-২৯ "
আমার এই অবস্থার পর…মন না যায়	"	১ম । ২৪৪ "
সকলে বলে…কথা কইত	"	২য় । ৫৬ "
(কামারপুকুরে) একদিন…ছেড়ে দিলুম	লীলাপ্র,	২য় । ১৭১ "
কি অবস্থা সব…চেনা যায় না	কথামৃত,	২য় । ১২৯ "
দেশে গেলুম…চলে এলুম (কলকাতায়)	"	২য় । ১৫১ "
তাকে সর্বভূতে দর্শন…তোলা হল না		২য় । ২১৭ "
ধ্যান করতে করতে…এইসব		৩য় । ১৫৬ "
হৃদে একদিন বলল…এরূপ হল	"	৩য় । ১৫৭ "
গঙ্গা প্রসাদ সেনের কাছে…দুধ খাব	"	২য় । ৬৯ "
একদিন অমনি…কান দেয়নি	লীলাপ্র,	২য় । ১৭৮ "
দিনরাত্রির প্রায় সময়ই…আশ্বস্ত হতুম	"	২য় । ১৮০-৮১ "
পর্ববিভাগ ৭		
কি অবস্থাই গেছে…সমাধি হয়ে গেল	কথামৃত,	২য় । ৫৬-৫৭ "
আমি কৃষ্ণকিশোরের…কি বলছ	"	৩য় । ৮৪ "
কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস…আরাম কোরো না	"	২য় । ১-৪ "

আলোচ্য পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
রোগাদির জন্য…টানতে পারবে না	কথামৃত,	৫ম । ৯০ পৃষ্ঠা
		২য় । ১-৪ "
কৃষ্ণকিশোর বলেছিল…শাস্ত্র জগৎ	"	৪র্থ । ৫৮ "
কৃষ্ণকিশোরকে দেখলুম…পারলুম না	"	৬র্থ । ৮৯ "
বললুম, মা…তাকে তা দেওয়া	"	৪র্থ । ২৯৫-৯৬ "
সেজবাবু বললে…কেউ চলে যাচ্ছে	"	৪র্থ । ৪৬ "
(সেজবাবুর) অদ্ভুতদর্শন…রক্ষা করবে	লীলাপ্র,	৩য় । ১৭৬ "
সেজবাবু বলেছিল…হার হয়েছে	"	৩য় । ১৭০-৭১ "
যখন রাধাকান্তের…তাকে দিতে পার	"	১ম । ৬৪-৬৫ "
পাছে অহংকার হয়…দরকার নাই	কথামৃত,	৩য় । ২১৪ "

পর্ববিভাগ ৮

আলোচ্য পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
আমি বৈষ্ণব চরণের….পা টিপি	"	৪র্থ । ১০৮ "
সেজবাবুর সঙ্গে…কথা ফোটে	"	১ম । ২৩৯ "
একদিন শুনলুম…হাসতে লাগলুম	"	২য় । ৬৪ "
আবার সেজবাবুর সঙ্গে…ভাব আছে	"	২য় । ৬৩ "
		১ম । ১৭৬ "
সেজবাবুর সঙ্গে অনেকদিন…থাকবে না	"	১ম । ১৭৬-১৭৭ "
সেজবাবুর ভাব হল…ভুক করেছে	"	৩য় । ১৮২ "
আমায় ডেকে…হাত বুলিয়ে দি	লীলাপ্র,	৩য় । ২০৫ "
সেজবাবুকে বলেছিলুম…নাই মানো	কথামৃত,	১ম । ২৪০ "

● দ্বিতীয় পর্ব ●

পর্ববিভাগ ১

আলোচ্য পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
তিনি আমায়…রাম রাম করতুম	কথামৃত,	৪র্থ । ১৮২ "
তন্ত্রমতের সাধনা…যোগাড় করত	"	৪র্থ । ২৪২ "
সে অবস্থায় শিবানীর…খেয়ে ফেলতুম	"	৪র্থ । ১৮৩ "

পর্ববিভাগ ১] বর্তমান পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ
একদিন দেখি বামনী…সম্পূর্ণ করলুম	লীলাপ্র, ২য় । ২০৪-৫ পৃষ্ঠা
বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত…উত্তীর্ণ হয়েছি	" ২য় । ২০৪ "
এই অবস্থায় যখন…হয়ে গেল	কথামৃত, ৪র্থ । ২৯৫ "
কুলকুণ্ডলিনী না জাগলে…এই অবস্থা	" ৪র্থ । ২৪৮ "
সে অবস্থায় অদ্ভুত…দেখলুম	" ৩য় । ১৫৪ "
এ সময় একটা…তবে বাঁচি	লীলাপ্র, ৪র্থ । ১০-১১ "
আমার সাক্ষাৎ ঐসব…পুড়ে গিছল	কথামৃত, ৩য় । ১৫৯-৬০ "
	" ৪র্থ । ২৬৯ "
আগে কইমাছ…এসে যায় না	" ৩য় । ১৮৯ "
পদ্মলোচন ভারি জ্ঞানী…ভাল লাগে না	" ১ম । ৮৮ "
পদ্মলোচন অতবড়…তার মৃত্যু হল	লীলাপ্র, ৪র্থ । ১০৪ "
	কথামৃত, ৪র্থ । ৫৮ "
	" ৪র্থ । ২৬৯ "

পর্ববিভাগ ২

বর্তমান পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ
রেল হবার আগে…এসে গেল	লীলাপ্র, ৪র্থ । ৪৯-৫৬
সে বাবাজী (জটাধারী)…কাঁদতে লাগলুম	" ৪র্থ । ৫৬-৫৯ "
এক একদিন রে ধে…এখানে রয়েছে	" ৪র্থ । ৬৫-৬৬ "
আমি 'রাম রাম' করে…হয়ে গেলুম	কথামৃত, ৪র্থ । ৩৯ "
দক্ষিণেশ্বরে রামমন্ত্র…করে দিলুম	" ৫ম । ৮২ "
কি অবস্থা গেছে…দর্শন হত	" ২য় । ২১৭ "
	" ৩য় । ১৫৪ "
আমি মার দাসীভাবে…শোয়াতে যেতুম	" ৩য় । ২৮, ৯২, ১২৬ "
	" ২য় । ৫৬, ১৭৫, ২১৭ "
	" ৫ম । ১৪০ "
আবার অবস্থা বদলে…পুরুষের দাসী	" ৩য় । ১৫৪ "
তখন তখন এমন…এই হীন দেহ	লীলাপ্র, ৩য় । ১৯১ "
	কথামৃত, ৪র্থ । ২৫১ "

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
পর্ববিভাগ ৩		
আমি এক জ্ঞানীর…অবস্থায় পৌঁছল	কথামৃত,	৩য় । ১৯৫ পৃষ্ঠা
	"	৪র্থ । ২৫১ "
	লীলাপ্র,	৩য় । ৫৪ "
ন্যাংটা আমায় শেখাতো…স্বস্বরূপে থাকবে	কথামৃত,	৩য় । ৯৫ "
	"	৩য় । ১০৭ "
ন্যাংটার কাছে বেদান্ত…লয় হয়	"	২য় । ৭৬ "
	"	৪র্থ । ৪৫ "
	"	" ৩০২ "
জ্ঞানীর ধ্যানের কথা…আমায় শেখালে	"	৩য় । ২৫৬ "
	"	২য় । ১২৬ "
কালীঘরে একদিন…চলে যাচ্ছেন	"	৪র্থ । ২৪১ "
পঞ্চবটীতে ন্যাংটার কাছে…কেঁদে ফেলত	"	৪র্থ । ৪৩ "
	"	৩য় । ১৯৫ "
গীতা ভাগবত…অধৈর্য হয়ে গিছল	"	৩য় । ১৪৮ "
	"	১ম । ১৯৯ "
ন্যাংটা বলতো, মতের…খাওয়ানো হল	"	৫ম । ৯৫ "
ন্যাংটা বলতো, তাদের…নিয়ম ছিল	লীলাপ্র,	৩য় । ২৫০ "
ন্যাংটা বলতো, মনের…মধ্যে থাকে	কথামৃত,	৫ম । ১১৯ "
বলত, এই সময়…বিলাতে নহি	"	৪র্থ । ২৫২ "
	"	৩য় । ১৯০ "
ন্যাংটা অতবড় জ্ঞানী…ফিরে এলো	"	৫ম । ২৩ "
বেদমন্ত্র সাধনের সময়…তখনও তিনি	"	৪র্থ । ১৮২-৮৪ "
উঃ, আমার কি অবস্থা…ভারতে আছে	"	২য় । ২৪২ "
যে অবস্থায় সাধারণ…ভাবমুখে থাক্	লীলাপ্র,	৩য় । ৫৫-৫৬ "
পর্ববিভাগ ৪		
একসময় এমনটা…ওটা দেখেছি	"	৪র্থ । ৬৯-৭১ "
মথুর যে চৌদ্দবছর…হতে থাকল	"	২য় । ৩০০ "

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
আমার তখন খুব···বিচার করছে	কথামৃত,	২য় । ৮৬ পৃষ্ঠা
যখন পেটের ব্যামোতে···গুণকীর্তন করব	"	৩য় । ৭৬ "
হৃদে কিন্তু আমার···যাওয়া হল না	"	১ম । ৯৬ "
	"	১ম । ১৬৯ "
	"	১ম । ১৭২ "
গোবিন্দ রায়ের কাছে···ঘেন্না হল	"	২য় । ১৫১ "
ঐ সময়ে আল্লামন্ত্র···ফললাভ করেছিলুম	লীলাপ্র,	২য় । ৩০৯ "
সাতবছর উন্মাদের পর···পারি না	কথামৃত,	২য় । ১৭১ "
গাড়ি করে যাচ্ছি···প্রণাম করলুম	"	৩য় । ১৯০ "
যখন আমি ওদেশে···চৈতন্যময় দেখছে	"	৪র্থ । ১১০ "
	"	২য় । ১৫৮ "
আমি এক জায়গায়···কি রকম বশ	"	৪র্থ । ২১০ "
ওদেশে হৃদয়ের ছেলে···তাঁর জন্য কান্না	"	৫ম । ২১২ "

● ঃ তৃতীয় পর্ব ●

পর্ববিভাগ ১

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
তীর্থে গেলুম···বলতে বলতে	কথামৃত,	২য় । ৪ "
	"	৩য় । ৩২-৩৪ "
পালকী করে শ্যামকুণ্ড···খুব হুঁশিয়ার	"	৩য় । ৩০ "
আমি বৃন্দাবনে ভেক···গাঁঠরী খোল	"	৩য় । ৩৪ "
মথুরার ধ্রুবঘাট···হয়ে গেলুম	"	৪র্থ । ৫০ "
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড···সেজবাবুও দেখেছিল	"	৪র্থ । ৫০ "
কাশীতে নানকপন্থী···ধারে হয়েছিল	"	২য় । ১৬৩ "
স্বামী স্ত্রী যদি···সবই বিপরীত	লীলাপ্র,	৪র্থ । ১২৪ "
কাশীতে মণিকর্ণিকার···দর্শন হল	কথামৃত,	৪র্থ । ২২৯ "
ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখলুম···অবস্থা বলে	লীলাপ্র,	৪র্থ । ১৩১ "

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
গঙ্গামায়ী বড় যত্ন···যেতে হবে	কথামৃত,	২য় । ১৬৬ পৃষ্ঠা
	”	৩য় । ৩৪ ”
যার হেথায় আছে···চেয়ে বেশি	লীলাপ্র,	৪র্থ । ১২০ ”

পর্ববিভাগ ২

আমি সবরকম···আরোপ করতুম	কথামৃত	৩য় । ১৫৪ ”
সজনে তুলসী এক···যায় যায় হত	”	৩য় । ১৫৮ ”
আমার বালকের মত···অসুখ করেছে	”	৪র্থ । ১৬ ”
দয়ানন্দ বলেছিল···কারণ শরীর	”	২য় । ১১৬ ”
হৃষীকেশ সাধু···এলে সমাধি	”	৩য় । ২৯০ ”
	”	৪র্থ । ২৪৮ ”
নারায়ণ শাস্ত্রীর খুব···দিয়ে এলুম	”	৫ম । ৯৫ ”
	”	৪র্থ । ১১২ ”
নারায়ণ শাস্ত্রী যখন···চেপে ধরেছে	”	৪র্থ । ১১৩ ”
জয়নারায়ণ পণ্ডিত খুব···দেহত্যাগ হল	”	৪র্থ । ৭৭ পৃ:
	”	৪র্থ । ২:০ ”
	লীলাপ্র,	৪র্থ । ১০৬ ”
ইঁদেশের গৌরীপণ্ডিত···লাভ করেছিল	কথামৃত,	৫ম । ৭৩-৭৪ ”
গৌরী বলেছিল···এক একটি রূপ	”	৪র্থ । ৬৫ ”
	”	৪র্থ । ৭৭ ”
সেজবাবুর সঙ্গে নবদ্বীপ···শক্তির বিকাশ	লীলাপ্র,	৪র্থ । ১৪৬ ”
(ভাইপো) অক্ষয় মোলো···দেখাচ্ছিস বটে	”	৩য় । ২৩ ”

পর্ববিভাগ ৩

যখন যেরূপ লোক···দেখেছি	কথামৃত,	৪র্থ । ২৯৫ ”
শম্ভু মল্লিক আমায়···আনন্দ আছে	”	১ম । ২১৭ ”
	”	১ম । ২৪৪ ”
বাগবাজার থেকে হেঁটে···মিলে যেত	”	২য় । ৬০ ”

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
আমি মাঝে মাঝে…শুনবেনই শুনবেন	কথামৃত,	৪র্থ। ১৮৪ পৃষ্ঠা
	”	৪র্থ। ২৭৫ ”
শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল…কর্ম আদিকাণ্ড	”	১ম। ৫১ ”
	”	১ম। ১২৭ ”
শম্ভু বলেছিল…কাঠ-মাটি	”	২য়। ৮৬ ”
নাকটেপা…সরল ছিল না	”	৪র্থ। ২১৪ ”

• চতুর্থ পর্ব •

পর্ববিভাগ ১

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
কেশব সেনের সঙ্গে…সমাজে গেল না	কথামৃত,	৪র্থ। ২৫০ ”
কেশব সেনকে প্রথম…হয়ে গেল	”	২য়। ১৭৬ ”
	”	৩য়। ১৬৩ ”
কেশবকে দেখতে যাবার…থাকতে পারে	”	১ম। ১৭৫ ”
	”	৪র্থ। ১১২ ”
আমি লাল পেড়ে…দিয়ে এসেছি	”	৫ম। ১৩২ ”
কেশব সেন শম্ভু মল্লিকের…ঈশ্বরাধীন	”	৫ম। ২৩ ”
আমায় পরোখ করবার…শুয়ে রইল	”	৪র্থ। ১১২ ”
কেশব সেনের বাড়ি গিয়ে…মানে না	”	৪র্থ। ১৭৫ ”
কেশব সেন বলেছিল…বিষয়চিন্তা	”	৪র্থ। ২৮৪ ”
কেশব সেন বললে…আছে তো থাক্	”	২য়। ১৮৮ ”
কেশব সেন, প্রতাপ…সাধন করা চাই	”	১ম। ১৫২ ”
কেশবের দলের একটি…চেহারা নাই	”	৪র্থ। ১৫১ ”
কেশব সেনের ওখানে…ইচ্ছা ছিল	”	১ম। ৮৪ ”
	”	২য়। ১৫০ ”
দেখলুম একজন ডেপুটি…ধারণা হয় নাই	”	৩য়। ১১৯ ”
(দয়ানন্দকে) দেখতে…সন্দেশ বল	”	২য়। ১৭৯ ”
কেশব সেনের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের…কালী মেনেছিল	”	১ম। ৯০-৯১ ”

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
আমি কেশবকে…প্রকাশ হল	কথামৃত,	৫ম। ৯৭ পৃষ্ঠা
কেশব সেন খুব আসত…হরিনাম ধরলে	"	৫ম। ১২৩ "
কেশব একদিন এসে…গোঁড়া বলবে	"	১ম। ৬৪, ৯১ "
	"	৫ম। ১২৪ "
কেশব সেন পরলোকের…চাকে দেয়	"	৩য়। ২২৯ "
কেশব এত পণ্ডিত…খাওয়ানো হবে	"	১ম। ২১৯ "
	"	৫ম। ১২৪ "
একদিন লেকচার দিলে…হাসতে লাগল	"	২য়। ১২৯ "
তাদের উপাসনা…শুনে হাসতে লাগল	লীলাপ্র,	৫ম। ১৩ "
আমি আবার কেশবের…অজ পড়ে গেছে	কথামৃত,	১ম। ১৮ "
	লীলাপ্র,	৫ম। ১৯ "
কেশব সেনের মা…ভক্তি দেখলুম	কথামৃত,	৪র্থ। ১৯০ "

পর্ববিভাগ ২

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
ওদেশে যখন হৃদের…ভেলকি লেগে যায়	"	৪র্থ। ১৭২ "
এ সব জায়গায়…লম্বা লম্বা কথা	"	৪র্থ। ১০৮ "
ওদেশে (শ্যামবাজারে) নটবর…সম্ভাবনা ছিল	"	৫ম। ৯২ "
সিওড়ে রাখাল ভোজন…থেকে চললুম	"	১ম। ১২৪ "
	"	২য়। ৫৬ "
রঘুবীরের নামের জমি · সঞ্চয় করতে নাই	"	৪র্থ। ৬০ "
যখন যেরূপ লোক…দেখিয়ে দিত	"	৪র্থ। ২৯৫ "
কাপ্তেন যেদিন আমায়…বেশ আছি	"	৪র্থ। ১১৩, ৯৫, ১৬৬
	"	২য়। ৭০ "
কাপ্তেনের বাপ খুব ভক্ত · বংশই ভক্ত	"	৩য়। ২০৪ "
	"	৪র্থ। ১৬৬ "
কাপ্তেনের অনেক গুণ…উপর বসবে	"	৪র্থ। ৯১, ১৬৬ "
	"	১ম। ১৭৮ "
লোকটা ভারী আচারী…তবে একটু থামে	"	১ম। ১৭৮ "

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
আমার অবস্থা কাপ্তেন…সবই চৈতন্য	কথামৃত,	৩য় । ২০৪-৫ পৃষ্ঠা
কাপ্তেন সংসারী বটে…ছেড়ে দেবো করত	”	১ম । ১৭৮ ”
আগে হঠযোগ…বাতাস করবে	”	৪র্থ । ১৬৬ ”
কাপ্তেনের সঙ্গে একটি…পুঁথিতে আছে	”	৪র্থ । ১১৬ ”
কাপ্তেনের সঙ্গে কথা…পায়ে ধরতে যায়	”	৩য় । ২০৩ ”
কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীন্দ্র…বেদনা হয়েছে	”	২য় । ১-৪ ”

পর্ববিভাগ ৩

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
এখানে একজন ব্রাহ্মণ…হাসতে লাগল	”	১ম । ৭৬ ”
হৃদে একটা এঁড়ে বাছুর…মূর্ছা ভেঙ্গেছিল	”	১ম । ৯২ ”
একদিন ঠাকুরবাড়িতে…দেখবে নাকি	”	১ম । ১৪৪ ”
কি অবস্থাই গেছে…এ কেয়া রে	”	২য় । ৬৪ ”
একটি বেদান্তবাদী…সমাধি হয়	”	২য় । ৭৬ ”
অনেক বছর আগে…ত্যাগ করেছে	”	১ম । ৬৯ ”
সংসারী লোকদের…দিলেই হবে	”	৫ম । ৯২ ”
ভোগ লালসা থাকা…মনে উঠে নাই	”	৩য় । ২৩ ”
	”	৪র্থ । ১৬৯-৭০ ”
পেঁয়াজ খেলুম আর…ফেলে দিলুম	”	৩য় । ১০৯ ”
আমার কামার বাড়ির…কামারে গন্ধ	”	২য় । ১৫১ ”

পর্ববিভাগ ৪

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
আমি তিন ত্যাগ…তবে হয়	”	৩য় । ৫৭ ”
এই অবস্থার পর…হানি হবে	”	৪র্থ । ১৪৬-৪৮ ”
লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী…ছেড়ে বাঁচি	”	৪র্থ । ১৯৪ ”
	লীলাপ্র,	৫ম । ২৮৬ ”
দ্বারিকবাবু বনাত…আসতে পারলুম	কথামৃত,	৩য় । ১০২ ”
	”	৪র্থ । ২৬৭ ”
টাকা ছুঁলে হাত…হয়ে থাকবে	”	৪র্থ । ২৬৭ ”
ধাতুর কোনো জিনিষ…মাপ করো	”	১ম । ১৮৯ ”

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
আমার যে কি…জ্ঞান হবে	কথামৃত,	২য় । ২৬৭ পৃষ্ঠা
কাম চলে যাওয়া…পড়তে দেন না	"	৩য় । ১৪৭ "
	লীলাপ্র,	৩য় । ৫৩ "
তখন তখন এমনি…তবে শান্তি	"	৩য় । ৬৬ "
ঐ অবস্থায়…কাঁদতুম	কথামৃত,	২য় । ৪ "
যে সমন্বয় করেছে…পাল্লা ভারী	"	৪র্থ । ১০৯ "
ভক্তিযোগে সব…জানিয়ে দিয়েছেন	"	৪র্থ । ১৮৮ "
খ্রীষ্টানদের বই…লোকশিক্ষা হয় ?	"	১ম । ৪৫ "
	"	৪র্থ । ২৭৭ "
এক হরিসভায়…ঘোড়া আছে	"	৩য় । ১৯৭ "
দেখেছি বিচার করে…দিতে হয় না	"	১ম । ২০২ "
পর্ববিভাগ ৫		
আমার এই একরকম…জীবজগৎ	"	৫ম । ৮৬-৮৭ "
অনেকদিন হল…খল রূপে	"	২য় । ১১২ "
মাকে ডেকে কেঁদে…আসতেই হবে	"	৪র্থ । ২৫১ "
যখন আরতি হত…প্রাণ যায়	"	৪র্থ । ২৯৫ "
তাদের সব দেখবার…তোর অন্তরঙ্গ	লীলাপ্র,	৪র্থ । ২০৮-৯ "
আমি শুদ্ধী খুঁজছি…ওজর করে	কথামৃত,	৩য় । ১৮১, ১৩১ "
হাজরা এখানে অনেক…কি কথা কই	"	৩য় । ১৮০-৮১ "
হাজরা আবার শিক্ষা…কেমন করে	"	২য় । ৫৫ "
হাজরার দোষ নাই…কম প্রকাশ	"	২য় । ৮৪ "
মাঝে মাঝে ও…তবে হয়	"	১ম । ১৮৩ "
হাজরা কোনো রকমে…জায়গায় আছেন	"	২য় । ১৫৭ "
হাজরা একটি…দরগা	"	৪র্থ । ৭ "
পর্ববিভাগ ৬		
নরেন্দ্র, রাখাল…বাড়ার ভাগ	"	১ম । ১০২ "
বটতলায় একটি…ভিতরে রয়েছে	"	৫র্থ । ২৯৫-৯৬ "
	"	২য় । ৯৩ "

আবার বলেছিলুম…রাখাল হল	কথামৃত,	২য় । ৯৪ পৃষ্ঠা
রাখাল আসবার…নিষেধ আছে	লীলাপ্র,	৫ম । ৫৯-৬৩ ”
রাখাল আমায় জিজ্ঞাসা…খাবি না	কথামৃত,	২য় । ১২০ ”
এইখানে বসে পা টিপতে…বাকী ছিল	”	৪র্থ । ১৭০ ”

পর্ববিভাগ ৭

নরেন্দ্র যখন প্রথম এলো…অরূপের ঘর	”	৪র্থ । ১৭১ ”
আশ্চর্য দর্শন সব হয়েছে…দেহত্যাগ করবে	”	৪র্থ । ২৫০ ”
নরেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম…বসে কাঁদতুম	”	২য় । ৫৫-৫৬ ”
	”	৩য় । ১৮২ ”
পশ্চিমের দরজা দিয়ে…সে-কিছুই নয়	লীলাপ্র,	৫ম । ৬৭-৭০ ”
যদু মল্লিকের বাড়িতে…মহাপুরুষ	”	৫ম । ১০৮ ”
নরেন্দ্রের খুব উঁচু ঘর…পুরুষ পায়রা	কথামৃত,	৪র্থ । ২৩৭ ”
নরেন্দ্র সভায় থাকলে…এত ভালবাসি	লীলাপ্র,	৫ম । ১৩৭ ”
নরেন্দ্রকে যখন দেখি…কখানা বাড়ি	কথামৃত,	২য় । ৮৬ ”
দেখলুম কেশব যেরূপ…দূর হয়ে গেছে	লীলাপ্র,	৫ম । ১৪৪ ”
একাধারে নরেন্দ্রের কত…দেখলে না	কথামৃত,	৫ম । ৭৩ ”
যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র…রাগ করবে না	”	৩য় । ১৮৫ ”
	”	৪র্থ । ৫৩ ”
আমি একদিন বলেছিলুম…আর লই না	”	৩য় । ১৮৫ ”
নরেন্দ্রকে বলেছিলুম, দেখ…হয় না	”	১ম । ১৩১ ”
নরেন্দ্র কাকেও কেয়ার… ওর অনুগত	”	১ম । ১০২ ”
	”	৫ম । ১৩১ ”
হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন…তিনি ভক্তাধীন	”	৩য় । ২১৫ ”
একদিন দেখছি মন…এ সেই ঋষি	লীলাপ্র,	৫ম । ১০৯ ”
তিনি মানুষ হয়েও…দর্শন হয়	কথামৃত,	২য় । ২১৭ ”
পূর্ণ নারায়ণের অংশ…আসবে না	লীলাপ্র,	৫ম । ২০০ ”

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
পর্ববিভাগ ৮		
আমায় সব ধর্ম একবার…পথ দিয়ে	কথামৃত,	৩য় । ৩২ পৃষ্ঠা
দেখলুম এক চৈতন্য…সব এক—অভেদ	"	৪র্থ । ৫২ "
ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা…খড়কুটো মনে হয়	"	১ম । ২৩৭ "
দেখলুম বিদ্যাসাগরকে…ফোটাও পড়ে না	"	৩য় । ১৯৫ "
বিদ্যাসাগর বলেছিল…বিশেষ শক্তি আছে	"	১ম । ১৫১ "
বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা…হলে কি হবে	"	২য় । ৭৩ "
বিদ্যাসারকে বলেছিলুম…ভারি খুসী	"	৪র্থ । ৩২ "
আমি তো মুখ্যু…ঠেলে দেন	"	১ম । ২৩৯ "
বঙ্কিম একজন পণ্ডিত…ভক্ত নাকি	"	১ম । ২৩৮ "
শিবনাথ বলেছিল…মানে বাহ্যজ্ঞান	"	২য় । ১৯০ "
কৃষ্ণদাস পাল এসেছিল…উপকার করবে	"	২য় । ১৭৭ "
আমি বলি নাহং…বল দেখি	"	১ম । ২৪০ "
বিজয়ের বাপ ভাগবত…সরল হয় না	"	৪র্থ । ১৯০ "
বিজয় এখন বেশ হয়েছে…অমনি সাষ্টাঙ্গ	"	৪র্থ । ১৭৫ "
বিজয়ের শাশুড়ি বললে…কুকুর জ্ঞানী	"	৩য় । ২০০ "
অচলানন্দ এখানে এসে…সে অচলানন্দ	"	৩য় । ৫৬, ৫৮ "
ঈশ্বরের আনন্দ পেলে…নিয়ে থাকি	"	৩য় । ১৬৯ "
পর্ববিভাগ ৯		
এই যে সব ইয়ংবেঙ্গল…না মানতো	লীলাপ্র,	৪র্থ । ২৩০ "
যদু মল্লিকের বাড়ি…বুঝতে পেরেছিলুম	কথামৃত,	২য় । ১৭৩ "
যাদের দেখি ঈশ্বরে…নৌকায় গিয়ে বসি	"	১ম । ৫৬ "
প্রতাপের ভাই এসেছিল…থেকে যেতে চায়	"	১ম । ১৮ "
রামপ্রসন্ন কেবল…দেখে কাঁদি	"	৪র্থ । ৯০ "
হরমোহন যখন…গা কেমন করছে	"	৪র্থ । ১১৩ "
হরিপদ সেদিন…অতো নয় রে	"	৪র্থ । ১৩০ "
ভবনাথ বিয়ে করেছে…নিয়ে থাকবো	"	৩য় । ১২৯ "

রাজেন্দ্র মিত্র…তিনি ও টাকা লন	কথামৃত,	৪র্থ। ৮৯ পৃষ্ঠা
সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে)…ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ	"	৫ম। ১৪৬ "
পাগলীর মধুর ভাব…সেই ভাব আছে	"	২য়। ২৫৯ "
আমায় একজন বলেছিল…কোমর বাঁধি	"	১ম। ৬৩, ১৭০ "
মুখ্যু সুখ্যু মানুষ…কিছুই জানিনা	লীলাপ্র,	৪র্থ। ২৫৩-৫৪ "
রামনারায়ণ ডাক্তার…টিপতে লাগল	কথামৃত,	১ম। ২৩৭ "
তারক বাড়ি ফিরে যাচ্ছে…যিনি আছেন	"	৪র্থ। ২২৩ "
অহংকারের বশে…স্পর্শ করে থাকি	লীলাপ্র,	৫ম। ৩৪৮ "
কামারহাটি থেকে যে…খুব ভক্তি বিশ্বাস	"	৪র্থ। ২৮৭ "
এরা সব যেন…এগিয়ে যাবে	"	৫ম। ৩৮৪ "

● পঞ্চম পর্ব ●

পর্ববিভাগ ১

আমার কি ভাব জানো…মা জানে	লীলাপ্র,	১ম। ৪৯
আমার তিন কথাতে…কাণ্ডারী	"	১ম। ১৬০ "
সবই ঈশ্বরাধীন…কিছুই হল না	"	১ম। ২৩৯ "
আমি যন্ত্র…তেমনি করি	"	১ম। ১৫৮ "
তাঁর কাণ্ড মানুষে…তাঁরই চিন্তা করি	"	৩য়। ৩৭ "
আমার ভাব কি রকম…ঠিক ওই ভাব	"	১ম। ২৫২ "
সেদিন বেণীপালের…মনে থাকে	কথামৃত,	৩য়। ১০৪ পৃ
আমায় বালকের অবস্থায়…তারপর অসুখ	"	৪র্থ। ১৯১ "
বালকবৎ, আবার ওই…ফষ্টি নষ্টি হয়	"	৪র্থ। ২১০ "
আমি একঘেয়ে কেন…নাম করে নাচি	"	১ম। ২২২ "
আমার বিড়ালছার…সন্তানভাব	"	২য়। ৭৯ "
আমি একজনকে…প্রণাম করি	"	৪র্থ। ১৬০ "
যার যা ভাব তার…ভগবান লাভ হবে	"	৪র্থ। ২১৩ "

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
সব রকম সাধন…তুমিই নানক	কথামৃত,	৪র্থ। ২৫১ পৃষ্ঠা
আমায় দেখিয়ে দিয়েছে…অত আমি জানি না	"	১ম। ১৮০ "
তার চৈতন্তে জগৎ…অভিমান হয় না	"	৩য়। ৩৯ "
কালীঘরে পূজা করতুম…পূজা বন্ধ হল	"	৩য়। ৭৫ "
দেখছি তিনিই সব…সর্বভূতে তিনি আছেন	"	২য়। ১৪৬ "
মানুষকে আমি ঠিক সেইরূপ…নীচে এসে পড়েছে	"	৩য়। ৭৬ "
এই পাখা যেমন…কথা কয়েছে	"	৩য়। ২৮৯ "
		৪র্থ। ২৪৯ "
আমার প্রায় একটু…বলা যায় না	"	১ম। ৮৫ "
একদিন ভাবে হালদার পুকুর…দর্শন হয় না	"	১ম। ১৭০ "
আমার সত্য কথার আঁট…পেট ভরাই	"	২য়। ১১২ "
আমি বেশি কাটিয়ে…জলে গেছি	"	২য়। ১৪৫ "
আমার কি অবস্থা…সব রকমই বলছি	"	৩য়। ৩৫ "
মা দেখিয়ে দেন যে…কিছু বলান	"	৫ম। ৭১ "
আমি একবার মিউজিয়াম…তাই হয়ে যায়	"	৫ম। ১০৮ "
মা আমার সন্ধ্যাদি…আর নেই	"	৪র্থ। ১১৮ "
আমার এই অবস্থার…কর্ম থাকে না	"	১ম। ৬৩ "

পর্ববিভাগ ২

দেহের অসুখ তা হবে…রূপটিও দেখছি	"	৩য়। ২৭৯ "
এর ভিতর দুটি…কেই বা বুঝবে	"	৩য়। ২৮১ "
শরীরটা যেন বাঁখারি…এইটি দেখছি	"	২য়। ২৭০ "
দেখি কি যেন গাছপালা…প্রণাম করলুম	লীলাপ্র,	৪র্থ। ১৬৮-৭০ "
সব দেখছি এক একটা…পড়ে রয়েছে	কথামৃত	২য়। ২৭০ "
অনেক মত অনেক পথ…আমিই তিনি	"	২য়। ১৬৪ "
সেদিন দেখলুম খোলটি…থেকেই যা কিছু	"	৩য়। ১৩৬ "
যার শেষ জন্ম…হবেই হবে	লীলাপ্র,	৪র্থ। ২০৯ "
সেদিন কলকাতায়…দিকে মন আছে	কথামৃত,	৩য়। ৫১ "
আগে অনেক দেখতুম…তত প্রকাশ নাই	"	৪র্থ। ২২২ "

পুস্তকের অংশ	আকর গ্রন্থ	
আবার অবস্থা বদলাচ্ছে…ভেলকী লাগ	কথামৃত,	৪র্থ। ২১২ পৃষ্ঠা
নির্বিকল্প অবস্থায় উঠলে…তবে খেতে পারি	লীলাপ্র,	৪র্থ। ২৪২ "
সেবার যাত্রার সময়…পারলুম না	কথামৃত,	৪র্থ। ২১১ "
একজন বাউল এসেছিল…তারপরে অসুখ	"	৪র্থ। ১৩৯-৪০ "
বটতলায় সন্ন্যাসীকে…ফুল ওপায়ে দিলুম	"	৪র্থ। ৮১ "
দেহ থাকতে কর্মত্যাগ…কি করলেই হয়	"	৩য়। ২৯৩ "
আমি দেখছি যেখানে থাকি…ভাবে হয়	"	২য়। ৯৩ "
অনেক লোক যখন…খেয়ে থাকব	লীলাপ্র,	২য়। ৩৭৭ "
	"	৫ম। ২৯৫ "
যাবার আগে হাটে হাঁড়ি…বোঝা যাবে	"	৫ম। ৩৮৪ "
শরীরটা কিছুদিন থাকত…ধ্যানজপ নেই	কথামৃত,	৩য়। ২৮১ "
এখানে সব আছে…তেঁতুল পর্যন্ত	"	৩য়। ২৮৯ "
এর ভিতর ঈশ্বরের সত্ত্বা…আকর্ষণ	"	৪র্থ। ২২৩ "
বাউলের দল হঠাৎ…ভক্তের জন্য	"	৩য়। ২৮১-২৮২ "
বাসনা না থাকলে…দেখে দেখে বেড়াব	"	৩য়। ৭৭ "
তিনিই বিদ্যামায়া রেখে…অপেক্ষা করতে হবে	"	৪র্থ। ২২৩ "
	"	" ২৪৭ "
	"	" ২৯৯ "
	লীলাপ্র,	২য়। ৩৭৭ "
তোমাদের কি আর…চৈতন্য হোক	লীলাপ্র,	৫ম। ৪০০ "

উপরে যে-সব পৃষ্ঠাসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিভিন্ন খণ্ডের নিম্নলিখিত সংস্করণ অনুযায়ী :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—

১ম ভাগ—সপ্তদশ সংস্করণ নবম পুনর্মুদ্রণ, ১৩৭৫
২য় ভাগ—তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৭
৩য় ভাগ—সপ্তম সংস্করণ, ১৩৪৭
৪র্থ ভাগ—সপ্তম সংস্করণ চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ, ১৩৭০
৫ম ভাগ—ষষ্ঠ সংস্করণ সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, ১৩৭৫

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—

১ম খণ্ড—পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৩৭৭
২য় খণ্ড—চতুর্দশ সংস্করণ, ১৩৭৩
৩য় খণ্ড—ত্রয়োদশ সংস্করণ, ১৩৭১
৪র্থ খণ্ড—দ্বাদশ সংস্করণ, ১৩৭৪
৫ম খণ্ড—পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৪৭